KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত
Title সমকালীন (SAMAKALIN)	Size 7"x 9.5" 17.78x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ২৭	Year of Publication : কার্তিক, ১৩৮৮
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের পত্রিকা

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

উনত্রিংশ বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৮৮

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

উনত্রিংশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা কার্তিক তেরশ অষ্টআশী

সমকালীন ।। প্রবন্ধের পত্রিকা

সূচীপত্র

তাম্রলিপ্ত তমলুক থেকে দূরে : জগদীশ চক্রবর্তী ৮১

জনশিক্ষায় লোকবৃত্ত : শঙ্কর সেনগুপ্ত ৯২

উত্তরবঙ্গের প্রবাদ ও ছড়ায় লোকশিক্ষা : পবিত্রকুমার গুপ্ত ৯৮

ভারতীয় দেববাদের অতি জাগতিক উৎস : দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল ১০২

সমালোচনা : আকাশের কথা : অশোককুমার বসু ১০১

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুশীল প্রিন্টার্স ২, ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৮৭ হইতে প্রকাশিত।

রবীন্দ্র রচনাবলী

সব-কয়টি-খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে। ২৭টি খণ্ডও অচলিত সংগ্রহ ২টি খণ্ড মোট ২৯টি খণ্ডের মূল্য

কাগজের মলাট ৯১৮·০০

রেক্সিনে বাঁধাই ১১০৪·০০

খণ্ডগুলি স্বতন্ত্রভাবেও সংগ্রহ করা যায়।

গীতাঞ্জলি ● নৈবেদ্য

পকেট সংস্করণ : দু'টি বই একটি প্যাকেটে মূল্য ৫·০০ টাকা

গীতাঞ্জলি ও নৈবেদ্য গ্রন্থ দু'টির পকেট সংস্করণ পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। তাঁদেরই আগ্রহে গ্রন্থ দু'টি পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থ দু'টির মূল্য যতদূর সম্ভব কম ধার্য করা হয়েছে বলে সর্বসাধারণকে কোনো কমিশন দেওয়া সম্ভব নয়—পুস্তকবিক্রেতারা শতকরা দশভাগ কমিশন পাবেন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলিকাতা ১৭

বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

সমকালীন

বর্ষ ২৯ কার্তিক ১৩৮৮

তাম্রলিপ্ত তমলুক থেকে দূরে

জগদীশ চক্রবর্তী

একদল ঐতিহাসিক বলেন, মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরই তাম্রলিপ্ত। অপর দল বলেন, তমলুকের নিকটবর্তী কোনখানে, কিন্তু প্রকৃত অবস্থানটি কোথায়?

প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার উত্তরসূরী হিসেবেই যে পরবর্তীকালে গাঙ্গেয় সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল একথা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আধুনিক কালের ভারত-তত্ত্ববিদরা অস্বীকার করেন না। পৌরাণিক যুগেই গঙ্গার উর্বর উপত্যকাকে কেন্দ্র করে সাকেত, মগধ ও তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি নগর-বন্দরে এক উন্নততর সভ্যতার বিকাশ ঘটে। নিঃসন্দেহে বর্তমান ভারত-জন সেই সাংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। দক্ষিণ-ভারতীয় তামিল-সভ্যতাও যে উত্তর-পূর্ব ভারতীয় তাম্রলিপ্ত-সভ্যতা থেকেই উদ্ভূত তা পণ্ডিত কনসভই পিলে ভাষাতত্ত্বের নিরিখে প্রমাণ করেছেন। আধুনিক বাংলার জনসমষ্টিতে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতীয় রক্তের প্রাচুর্য ছাড়াও নানা বিদেশী রক্ত-প্রবাহ রয়েছে তাও প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ঘটনা। আর এসবের পটভূমি রচিত হয়েছিল ঐ গাঙ্গেয় সভ্যতার ঊষা-লগ্ন থেকেই। কিন্তু এই মিশ্রিত সংস্কৃতিতে তাম্রলিপ্তের ভূমিকাটি কি, তা আজও অনুমান-নির্ভর মাত্র। তাম্রলিপ্ত বন্দর স্থানটি অনাবিষ্কৃত থাকার ফলে স্বরূপটি আজও অজ্ঞাত।

অবশ্য W H Scoff, J W Crindle প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেছেন যে, মেদিনীপুর জেলার আধুনিক তমলুক শহরই তাম্রলিপ্তর হীন পরিণতি। কিন্তু তাঁদের এই অনুমান-নির্ভর সিদ্ধান্তটি বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকদের দ্বিধাহীন স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। অবশ্য স্বীকার্য যে, এই সিদ্ধান্তটি পরবর্তীকালের চিন্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাঁদের এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে কারণ হিসেবে হয়তো কাজ করেছে প্রধান তিনটি ঘটনা—প্রথমত নামের সাদৃশ্য, দ্বিতীয়ত গঙ্গা বা হুগলী নদীর

নিকটবর্তী অবস্থান এবং সাগর-সান্নিধ্য। দেখা যায় যেএ বিষয়গুলি সকলেরই জিজ্ঞাসুদৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, ফলে আজও তাম্রলিপ্ত অনুসন্ধানের কর্ম-চক্রটি তমলুককে কেন্দ্রকরেই বার বার আবর্তিত।

বাংলার ব্রতচারী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শুকসদয় দত্তের চেষ্টাতেই তাম্রলিপ্ত অনুসন্ধানের বিশেষ করে প্রত্ন-বস্তু অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রথম পর্বটি শুরু হয়। সরকারী উদ্যোগ শুরু হয় ১৯৫৫ সালে। তমলুক শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচিত কেন্দ্র-বিন্দুতে প্রত্ন-উৎখননের কাজ চলে। এই উৎখননের নেপথ্যে শ্রীপরেশ দাশগুপ্তর ভূমিকা অবশ্য উল্লেখ্য। উৎখননের ফল সাধারণভাবে উৎসাহজনক। খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী থেকে মৌর্য (Late Maurya) সুঙ্গ, কুষাণ, রোমীয় বা ভূমধ্যসাগরীয় ও গুপ্তযুগের প্রত্ন-প্রমাণও আবিষ্কৃত হয়। গুপ্ত-পরবর্তীকালীন প্রত্নস্মারক বা পাল-সেন-যুগীয় স্মারক সামান্য কিছু পাওয়া গেল। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষে B. B. Lal যে বিবৃতি দিলেন, তাতে নৈরাশ্যের ছোঁয়াই তো বেশী। তিনি লিখলেন—'Indeed is not the location of Tamaluk, on the mouth of the Rupnarayana (a distributory of the Ganga) not far from the Bay of Bengal, immensly suited for a sea-born trade. (From the Report of Archeological Survey of India, by Sri B. B. Lal, Dec., '61, p. 36.)

বিবৃতিটির বয়ান থেকে স্পষ্টই প্রতীত হচ্ছে যে, প্রত্ন-বস্তু যা পাওয়া গিয়েছে, তা সিদ্ধান্তের অনুকূল নয়। তাই পূর্বসূরীদের মত তিনিও গঙ্গা ও সাগরের দিকে তাকিয়ে ভৌগোলিক সম্ভাবনার উপর জোর দিয়ে জিজ্ঞাসা-সূচক মন্তব্য করেছেন।

অপর প্রান্তে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, 'The molern town of Tamluk, which roughly represents the old site, is on the right bank of the river Rupnarayan, about twelve miles from the junction with the Hooghly. (R. C. Majumdar Hist. of Ancient Bengal Cal 1971, p. 345.)

তিনি আরও একটু ব্যাখ্যা করে এরই সংগে বলেছেন যে, হয়তো কোন সময় সরস্বতী নদী তমলুকের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকবে। অর্থাৎ তমলুক সম্পর্কে তিনিও সন্দেহমুক্ত নন। তবে কাছাকাছি হতে পারে এ ইঙ্গিত 'roughly represent' এই বক্তব্যের মধ্যেই যেন আভাসিত।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে, এই সন্দেহের নেপথ্যে কারণ বা কারণগুলি কি কি? আর কেনই বা তাঁরা সংগৃহীত প্রত্নবস্তুগুলিকে এতখানি উপেক্ষা করছেন?

মনে হয়, এই উপেক্ষার কারণগুলিকে অনুসরণ করতে হলে প্রথমেই তাম্রলিপ্তের ঐতিহাসিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্যটির খোঁজ নিতে হবে। জানতে হবে কি কি বৈশিষ্ট্য তাকে অন্যান্য নগর-বন্দর থেকে পৃথক একটি সত্তা দিয়েছিল, এবং কি কি ঐতিহাসিক প্রত্ন-স্মারক তার সেই স্বকীয়তাটিকে সুচিহ্নিত করতে সক্ষম। এগুলির খোঁজ না নিলে, ঐ উপেক্ষার রহস্যভেদ সম্ভব নয়। আর সেই প্রত্ন-বস্তুগুলিকে নির্দ্ধারণ করতে হলে ইতিহাসে প্রাপ্ত উপাদানগুলির যথাযথ অনুসরণ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ঐতিহাসিক বিবরণগুলির অনুসরণে একথা প্রায় নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, এযাবৎ প্রাপ্ত তথ্যগুলির মধ্যে চৈনিক পরিব্রাজকদের বক্তব্যেই তাম্রলিপ্তের বৈশিষ্ট্য-সূচক ইঙ্গিতগুলি

সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে। অতএব অন্ততপক্ষে তাঁদের বিবরণগুলিকে ভিত্তি করেই এ বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যায়। তাঁদের বর্ণনায় দেখা যায়, ৭ম শতাব্দীতেও এখানে কমপক্ষে ৫৬টি বৌদ্ধ-বিহার, একটি বৌদ্ধ-স্তূপ এবং প্রায় ২০০ ফুট উচ্চ একটি অশোক-স্তম্ভের অস্তিত্ব বর্তমান। অন্ততপক্ষে চারটি বুদ্ধমূর্তি এবং রাজধানীর কথাও তাঁদের বর্ণনায় স্থান পেয়েছে। এগুলিই তো তাম্রলিপ্তের প্রত্ন-নিদর্শনের প্রকৃতিকে নির্ধারিত করছে। তাম্রলিপ্তকে প্রত্ন-স্মারক দিয়েই চিহ্নিত করতে হলে, এগুলিকে অবহেলা করা যায় কি? তবে এগুলির সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, এমন কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আলাদা ব্যবস্থা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী বি. বি. লাল বা ডঃ মজুমদার তমলুকে প্রাপ্ত পুরাবস্তুগুলিকে যদি উপেক্ষাই করে থাকেন, তাতে তাঁরা কি কোন অবিচার করেছেন?

অবশ্য তমলুকে অধুনা-প্রতিষ্ঠিত 'তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণাগারের' সংগ্রহে উন্নতমানের এবং অভিনব ধরণের প্রত্ন-বস্তুর পরিচয়ই মিলছে। অতি সম্প্রতিকালে খনিত রঘুনাথবাটীর ভূ-গর্ভে বা ২৪-পরগণার 'বেড়াচাঁপা'র সংগ্রহেও প্রভূত প্রত্ন-নিদর্শন আবিষ্কৃত। আমরা বলতে পারি, এ সমস্ত সংগ্রহের মধ্যে তাম্রলিপ্ত-নির্দেশক স্থির প্রত্ন-বস্তুগুলির নিদর্শন আজও প্রত্যক্ষ হয়নি। অবশ্য একথাও স্বীকার্য, উপরিউক্ত সংগৃহীত প্রত্ন-সংগ্রহগুলির উপর গবেষণা আজও হয় নি, অথবা অসম্পূর্ণ।

প্রাচীন নদ-নদী-প্রবাহ প্রসঙ্গেও আমরা বলতে চাই, তমলুকের পাশ দিয়ে সরস্বতী নদীর কল্পনাও অনুরূপভাবে অবাস্তব হতে বাধ্য। সরস্বতী প্রবাহ এক সময় গঙ্গার বিলুপ্ত প্রাচীনতর গতিগুলির দক্ষিণতম খাতে প্রবাহিত হ'ত—এটি স্বীকৃত তথ্য। তাই তমলুকের পাশে রূপনারায়ণের খাতে সরস্বতী প্রবাহ গঙ্গার প্রাচীন অস্তিত্বের কথাই বলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সরস্বতী বা গঙ্গার প্রাচীনতর প্রবাহ যদি কোন এক সময় তমলুকের [তাম্রলিপ্ত হিসেবে] পাশ দিয়ে রূপনারায়ণের খাতে প্রবাহিত হয়ে থাকত, তা হ'লে ৮ম শতাব্দীতেই তাম্রলিপ্তের বন্দর-খ্যাতি প্রভাহীন হ'য়ে যেত না। অপরপক্ষে তমলুকের পাশে সরস্বতী প্রবাহের সম্ভাবনা স্বীকার করলেও সেই প্রবাহটি নিশ্চিত-ভাবে ষোড়শ শতাব্দী বা তারও পরবর্তী কালেরই ঘটনা এবং যার সঙ্গে প্রাচীনতর গঙ্গাপ্রবাহে যোগ অসম্ভব। ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের জ্যাও ডি ব্যারোসের আঁকা ম্যাপই তার প্রমাণ।

আবার [তর্কের খাতিরেই?] তমলুক থেকে প্রায় বার মাইল দূরে যে হুগলী-সঙ্গমের কথা [about twelve miles from the junction with the Hooghly] বলা হয়েছে, সেই হুগলী বা গঙ্গা প্রবাহের জীবনতো নবাব আলীবর্দীরই দান। অর্থাৎ ১৮শ শতাব্দীর পূর্বে এ গঙ্গার তো অস্তিত্বই ছিল না।'১

যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে চৈনিক পরিব্রাজকরা বলেছেন, তাম্রলিপ্তে জলপথ ও স্থল পথের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তমলুকের ক্ষেত্রে জলপথ-সংযোগের অতীত সম্ভাবনাটি স্বীকার করা গেলেও, তাম্রলিপ্তের পরিমণ্ডলে স্থল-যোগাযোগের যে চতুর্মুখী চিত্রটি পাই, তমলুকের ভূ-পৃষ্ঠে তার কল্পনা আকাশ কুসুমই। অন্তত আজ পর্যন্ত এমন কোন তথ্য মেলেনি যাতে স্থলপথের বাস্তবতাটি অনুমানেও ধরা পড়ে। বরং বলা যায়, ১৭শ শতাব্দীতেও তমলুকবাসী পৃথিবী থেকে স্থলপথে বিচ্ছিন্নই ছিল। অতীত হিজলী জেলার ইতিহাসেও ঐ তথ্য সমর্থিত হয়। আমরা বিস্মিত হয়েই লক্ষ্য করছি যে, এ

প্রসঙ্গটিকে প্রায় সকলেই কেন যেন এড়িয়ে যাচ্ছেন।

আর নামের ক্ষেত্রে যে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, 'তাম্রলিপ্তক' বা 'তমোলোকে'র সংগেই। এগুলি তো সাহিত্যের বনেদীয়ানার নাম। কারণ দেখা যাচ্ছে ৮ম শতকের সর্বশেষ সমর্থিত সংবাদে অর্থাৎ কবি দণ্ডীর 'দশকুমার—চরিতে'-র বর্ণনায় 'তাম্রলিপ্ত' স্থানীয় ভাষায় বা উচ্চারণে 'দামলিপ্ত' নামেই পরিচিত। এবং তা হয়ে থাকলে 'দামলিপ্ত' থেকে 'তমলুক' নাম-বিবর্তন কিভাবে স্বাভাবিক মনে করা যায়? 'তমলুক' নামের উৎস সম্পর্কেও তথ্য-ভিত্তিক কোন খোঁজ-খবর আজ পর্যন্ত নেওয়া হয় নি। তাছাড়া কেবলমাত্র নামের সাদৃশ্যই প্রমাণ হিসেবে অভ্রান্ত বলে গৃহীত হতে পারে না। তাই ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস'-এ যেভাবে তমলুককেই তাম্রলিপ্ত-স্বীকৃতি দিয়েছেন তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য হ'তে বাধ্য।

এই অবসরে তমলুকের বিখ্যাত 'বর্গভীমা' দেবীর কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তমলুকের সংগে বর্গভীমা দেবীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য বলেই জনশ্রুতিতে প্রকাশ। কিন্তু বিস্ময়ের সংগেই লক্ষ্য করতে হয়, এযাবৎ প্রাপ্ত ইতিহাস সমর্থিত তাম্রলিপ্ত-কথায় বর্গভীমা-প্রসঙ্গ একেবারেই অনুচ্চারিত, যদিও অন্যান্য দেবী-প্রসঙ্গ বিরল নয়।

তাই ডঃ মেঘনাদ সাহার বিখ্যাত উক্তিকে অনুসরণ করেই বলতে চাই, তাম্রলিপ্তের মত প্রাচীন নগর-বন্দরকে খুঁজতে গেলে, আমাদের দেশের প্রাচীন ভূগোলকেই আগে চিনতে হবে, ভাগীরথী-গঙ্গার প্রাচীনতর লুপ্ত গতিপথগুলি নির্ধারণ করতে না পারলে তদানীন্তন ভৌগোলিক অবস্থাকেও বোঝা যাবে না। সেটি করতে গিয়েই আমরা বুঝতে পেরেছি, গঙ্গার প্রাচীনতর খাতগুলি নিম্নতম গতিতে কংসাবতীর সংগেই যুক্ত ছিল, রূপনারায়ণের সংগে নয়। তাই রূপনারায়ণের তীরে তাম্রলিপ্তকে খোঁজা বৃথা। আমাদের এ ধারণাকে সমর্থন করছে পর্তুগীজ জ্যাও ব্যারোসের ১৫৫০ সালের ম্যাপ। আবার ঐ ম্যাপটি বুঝতে সাহায্য করেছে বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসা মঙ্গল'-বর্ণিত গঙ্গা-গতি, বৃন্দাবন দাসের কড়চা, কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্য চরিতামৃত' এবং কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডী-কাব্য [১৫৯৫]। এর থেকেই পাওয়া গেল ভাগীরথীর বেতড়-উলুবেড়িয়া-পাশকুড়া-পিংলা ও নারায়ণগড়-গামী লুপ্ত খাতের হদিশ। এটি পাওয়ার পরই গঙ্গা-গতির রহস্যগুলি একে একে উন্মুক্ত হয়ে যায়। কালীঘাটের গঙ্গাকে [আদি গঙ্গা] ভাগীরথী-গঙ্গার তৃতীয় প্রবাহের খাত বলা হয়ে থাকে, আমাদের মনে হয় ওটিকে গঙ্গার চতুর্থ প্রবাহই বলা উচিত। ভাগীরথীর প্রথম প্রবাহটি বর্তমান গৌড় ও মুর্শিদাবাদের পথে বর্ধমানের সীমায় নাকাশিপাড়া পূর্বস্থলী হয়ে বর্ধমান উত্তর তীরে রেখে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী পথে অতিক্রম করে হুগলী-বাঁকুড়ার সীমায় সীমায় মান্দারণের পশ্চিম পাশ দিয়ে সোজা দক্ষিণে গিয়ে চন্দ্রকোণাকে পশ্চিম তীরে নাড়াজোলের পর পাশকুড়া-ডেবরার মাঝখান দিয়ে পিংলার উত্তরে দ্বিমুখী ধারায় ময়না ও নারায়ণগড়ের পথে সমুদ্রে মিলত। আর দ্বিতীয় প্রবাহটি প্রায় ঐ পথেই মান্দারণকে [পূর্বপথ এখানেই বিশেষভাবে পরিবর্তিত] পশ্চিমতীরে রেখে ঘাটাল-বরদা-দাসপুরের পথে এসে নাড়াজোলে প্রথম খাতে মিলে পূর্ব পথেই পিংলার কাছে সমুদ্র সংগত। পরবর্তী-কালে ভাগীরথীর মূল স্রোত যখন নবদ্বীপের পথে দক্ষিণমুখী হল, তখন এই দ্বিতীয় খাতটি দিয়েই সরস্বতী কিছুকাল অন্তত বয়ে যায়। গঙ্গার প্রথম প্রবাহ কালে মান্দারণ ছিল পূর্ব তীরে; কিন্তু দ্বিতীয়

প্রবাহের সময়ে মান্দারণকে পশ্চিম তীরে রেখেই গঙ্গা সাগরমুখী হ'ত। তাই ব্যারোসের ম্যাপে সরস্বতীর পশ্চিম তীরেই মান্দারণের অবস্থানটি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত। ভাগীরথীর এই গতি তিনটির মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় খাতটি যতদিন সুনাব্য ছিল, ততদিনই তাম্রলিপ্ত বন্দর খ্যাতি হারায় নি। এ দুটি প্রবাহেরই [এবং সরস্বতীরও] মোহনা মুখের পশ্চিম তীরে এবং সমুদ্র উপকূলের নিকটেই 'লোয়াদা'র অবস্থান। আমরা বলতে চাই মেদিনীপুর সদর মহকুমার অন্তর্গত ডেবরা থানার ডেবরা-ভবানীপুর বিস্তৃত ভূমিই তাম্রলিপ্ত বা দামলিপ্তের আধুনিক ঠিকানা। পাঁশকুড়া ষ্টেশন থেকে এর দূরত্ব বাসে ১২ মাইল পথ মাত্র।

যে বৈশিষ্ট্যগুলির অভাবে তমলুককে তাম্রলিপ্ত বলা যাচ্ছেনা, সেই বৈশিষ্ট্যগুলি কি লোয়াদার আছে? বর্তমানে প্রশ্ন এটিই। আমরা এখানে সেই প্রসঙ্গেই আলোচনায় আসতে চাই।

তাম্রলিপ্তের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে যতদূর জানা গেছে তা থেকে অন্ততপক্ষে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত মিলছে। প্রথমত গঙ্গা-প্রবাহের [প্রথম ও দ্বিতীয় খাতের] মোহানার পশ্চিম তীরে এবং সমুদ্র উপকূলের কাছেই তার অবস্থান। দ্বিতীয়ত এখানে তিনটি প্রধান জলপথ ও চারটি স্থলপথ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তৃতীয়ত এটি পূর্ব-ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তের বন্দর।

সংক্ষেপে ভাগীরথীর লুপ্ত খাতগুলির কথা আমরা বলেছি। মহাভারতে গঙ্গার দক্ষিণে বকদ্বীপের [অধুনা বগড়ী কথা] উড়িষ্যারাজ অনন্তবর্মন চোড় গঙ্গের বিজয় অভিযানে গঙ্গাতীরে 'মন্দারে'-র উল্লেখ, জ্যাও ডি ব্যারোসের ম্যাপে সরস্বতীর পশ্চিম তীরে মান্দারণের অবস্থান, ফন ডন ব্রোকের ম্যাপে মেদিনীপুরের পূর্ব থেকে বর্ধমান ও উত্তর পূর্বমুখী পথ চিহ্ন, প্রাচীন বর্ধমান রাস্তা এবং সর্বোপরি ভূমি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য—প্রভৃতির সুদৃঢ় সাক্ষ্যভিত্তিতেই আমরা বলতে চেয়েছি, ভাগীরথীর লুপ্ত খাতগুলি মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশের নাব্যভূমির উপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছিল। আরও বলতে চাই, লোয়াদা-পাশকুড়ার মধ্যবর্তী প্রশস্ত খাত দিয়েই (৭ কি. মি. প্রায়) দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা পিংলার কাছেই সমুদ্রে মিলত। লোয়াদা থেকে পিংলার সমুদ্রের দূরত্ব ৮ মাইলের বেশী নয়। পিংলার উত্তরেই গঙ্গা দ্বিমুখী। একটি খাত বা বাহু বিশাল বিস্তার নিয়ে পিংলার পূর্ব দিয়ে রঘুনাথবাড়ী ও তমলুকের মত প্রাচীন দ্বীপগুলিকে উত্তর তীরে রেখে পূর্ব-দক্ষিণে সাগরে পড়ে সুবর্ণভূমি (নিম্নব্রহ্মদেশ) ও চীনের পথে নৌ-যোগাযোগ স্থাপন করত। বর্তমান কাঁসাই-এর নিম্নগতি ক্ষীরাই-চণ্ডা-হলদী নদী বিধৃত পথটিই সেই ঐতিহাসিক জলপথের স্মারক। বর্তমান হলদিয়া-বন্দর কংসাবতী-তীরের তাম্রলিপ্তের ঐ ঐতিহাসিক জলপথের উপরই অবস্থিত। এই জলপথটি দিয়েই পরিব্রাজক ঈং-সিঙের অর্ণব-পোত তাম্রলিপ্ত-ব্রহ্মদেশ ও চীনের পথে যাতায়াত করেছিল। পিংলার দক্ষিণে ও পূর্বের স্থলভাগ তাম্রলিপ্ত-যুগের পরবর্তীকালের বলেই মনে হয়। ময়না ও সবং তো আজও সমুদ্রের স্মৃতি বুকে নিয়েই বাস করে। ব্যারোসের ম্যাপের সঙ্গে পরবর্তী ম্যাপগুলির তুলনা করলে, বা প্রাচীন হিজলী জেলার অবস্থানটির খোঁজ নিলেও এ ধারণা সমর্থিত হয়। তাছাড়াও এখানকার ভূমি সে সাক্ষ্য বহন করছেই।

অপর মোহনা-মুখটি পিংলাকে দক্ষিণে ও পূর্বে রেখে খড়্গপুর, নারায়ণগড় ও দাঁতনের পূর্বাংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পালোরা-সিংহল ও পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে নৌ-যোগাযোগ সহজতর করে দেয়।

এই সমুদ্র-পথেই টলেমী ও ফা-হিয়েন দেশে দেশে ফেরেন।

সংক্ষেপে ডেবরা থানার পূর্বে ও দক্ষিণে, বর্তমান সুন্দরবন অঞ্চলের মত একটি দ্বীপময় ভূভাগের ইঙ্গিত মিলছেই এবং এ বর্ণনা মহাভারতে, দশকুমারচরিতে এবং কথাসরিৎ সাগরে আমরা পেয়েছি। কালিদাসের রঘুবংশে এগুলিকেই বলা হয়েছে 'বঙ্গান্ নৌ-সাধনোদ্যতান্'। আর নাড়াজোলে যেখানে কপিশা (কাঁসাই) গঙ্গাস্রোতে মিলত, সেখান থেকেই গঙ্গামোহনা বা সমুদ্র-খাড়ির শুরু। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল টলেমি-কথিত Kambyson মোহনাটির, শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী যার ব্যাখ্যা করেছেন,—কালিদাস কথিত কপিশা-মুখ বা বর্তমান কাঁসাই-এর মুখ, এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী ব্যাখ্যা করেছেন গঙ্গার তাম্রলিপ্ত নিকটবর্তী মোহনামুখ।

নাড়াজোলের মাটিতেই এর সাক্ষ্য রয়েছে। মেদিনীপুর জেলার প্রায় সমস্ত ছোট-বড় খাল ও নদীগুলি এখানে এসে মিলিত হয়ে আবার ছত্রাকারে উত্তরে, দক্ষিণে এবং পূর্বে প্রবাহিত। মল্লভূম, চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, মান্দারণ এমন কি বরদার ঐতিহাসিক গুরুত্ব শীলাবতীর দান নয়। মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-হুগলীর যৌথ সীমার কাছ থেকে আসা 'বুড়ীগাং' নদীই (বা রঙ্গার খাল) সেই গৌরবের কারণ। 'বুড়ীগাং' আসলে বুড়ীগঙ্গাই। শীলাবতী বুড়ীগঙ্গার উপনদী মাত্র। বর্তমান শীলাবতী-বুড়ীগাং-এর যুক্ত খাতই ভাগীরথীর দক্ষিণতম অংশ। এটির সঙ্গে সমুদ্রপথের যোগাযোগ ফন ডন ব্রোকের আমলেও বর্তমান ছিল, যদিও ভাগীরথীর উপরের প্রবাহটি তখন আর জীবন্ত ছিল না। তাই চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই ও নাড়াজোল থেকে শুরু করে পাঁশকুড়া ও পিংলার পশ্চিমে মাঠে মাঠে পুরানো নৌ-যানের ধ্বংসাবশেষ আজও মিলছে। নারায়ণগড়ের বর্গভিবির কাছে জাহাজ-বাঁধা খুটি পাথরের বাদামাকৃতি নোঙর, এগরার 'কুঁদি-গঙ্গা' এবং সাবং-এর কপিলেশ্বর শিব প্রভৃতি অসংখ্য প্রত্ন-প্রমাণ এই সমস্ত অঞ্চলে গঙ্গা ও সমুদ্রের অবস্থানকে আজও চিহ্নিত করেছে। স্থানীয় ইতিহাসে, পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় এগুলি প্রায়ই আলোচিত হচ্ছে, যদিও প্রকৃত অবস্থানটি আজও রহস্যাবৃত।

অপরদিকে ভাগীরথীর উলুবেড়িয়া-নারায়ণগড়গতি প্রসঙ্গে যুক্তির বাস্তবতাটিও নানা আলোচনায় নানা ভাবে স্থান পেয়েছে। ব্যারোসের সমসাময়িক শ্রীচৈতন্যদেব ১৫১২ খৃষ্টাব্দে আদি গঙ্গার (কালীঘাট) পথে ছত্রভোগ, বাকইপুরের পর জলপথে নারায়ণগড়ে আসেন। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা ও কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র বর্ণনা অনুসারে নারায়ণগড় বা দাঁতনের কাছে 'গঙ্গাঘাটে'র অস্তিত্ব ছিলই। এ গঙ্গা 'বেতড্ড-চতুরক লিপি'রই গঙ্গা। ব্যারোসের কিছু পরবর্তীকালের (১৫৯৫) মুকুন্দরামের চণ্ডী কাব্যেও বেতড়ের পর ডাইনে (পশ্চিমে) এই গঙ্গা-প্রবাহের কথাই বলা হয়েছে। শ্রীমন্তের ভিঙা এখানেই "ডাহিনে এড়াইয়া যায় হিজলীর পথ" ৩

হিজলী প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের ইতিহাস-কার শ্রীযোগেশচন্দ্র বসুও বলেছেন, 'কাটি-গঙ্গা' বা নিমকী-র খালে-'র কথা। তিনি স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন, "কিন্তু এই পথ দিয়া অতি অল্প দিনেই উড়িষ্যায় যাওয়া যাইত।" (৪) এটি ব্যারোসের ম্যাপেরও বক্তব্য। আমরা এটিকেই ভাগীরথীর তৃতীয় পর্যায়ের পথ বলতে চেয়েছি।

আলোচিত অংশে আমরা ভাগীরথীর লুপ্ত খাত তিনটির মোহনা অংশকেই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। লোয়াদার তাম্রলিপ্ত অবস্থায় প্রথম দুটি খাত-পথেই যে তদানীন্তন ত্রিমুখী জলপথ যোগটি

সম্ভব হয়েছিল, তার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে ব্যারোসের ম্যাপকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সরজমিনে মিলিয়ে নেওয়া হয়নি বলেই গঙ্গা-গতি এবং তাম্রলিপ্তের প্রকৃত অবস্থানকে চিনে নেওয়া যায়নি।

পক্ষান্তরে স্থল-যোগাযোগের যে চতুর্মুখী চিত্রটি তাম্রলিপ্তের পরিবেশে রচিত হয়েছে, তাও অদ্যুনা ডেবরা-লোয়াদার সীমানায় আজও বাস্তব। আধুনিক ৬ নং জাতীয় সড়ক, মেদিনীপুর-উলুবেড়িয়ার প্রাচীন পথ, উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড প্রভৃতি রাজপথগুলি প্রাচীনতম পথগুলির নবীকরণ ও সম্প্রসারণ মাত্র। ঐ পথ দিয়েই পূর্বমুখী সমতটের (উলুবেড়িয়ার পথে), পশ্চিম অভিমুখী গয়া ও অযোধ্যার পথ এবং দাক্ষিণাত্য অভিমুখী পুরীর পথ-সংযোগ রচিত হয়েছিল। উত্তরমুখী কর্ণসুবর্ণের পথটি পরবর্তী কালের বর্ধমান রাস্তাকেই মোটামুটিভাবে অনুসরণ করত। ডেবরা-কেশপুরের সীমা দিয়ে বংশাবতীর তীরে পায়ে-চলা পথটি কেশপুর থানার কাছে বর্ধমান রাস্তায় যুক্ত হয়ে গঙ্গার লুপ্ত-খাতের তীরে উত্তরমুখে ও পরে হুগলী-বাঁকুড়ার সীমায় পূর্বমুখে বর্ধমান হয়ে কর্ণসুবর্ণ ও মধ্যভারতের দিকে প্রসারিত ছিল। এই পথের চিহ্নটি কিছুটা অবিকৃত হয়ে গেলেও, প্রাচীনতম সংযোগটিকে আজও চিনে নেওয়া সম্ভব। পূর্বভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে (যেহেতু এর পূর্বেও দক্ষিণেই সমুদ্র) যোগাযোগের এই বৈচিত্র্যটি অন্যত্র দুর্লভ। ডেবরার পূর্ব প্রান্তে 'আষাঢ়ী বাঁধে'-র বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আজও আমরা সেই লুপ্ত গঙ্গা বা সরস্বতী খাত, সমুদ্র উপকূল এবং স্থল ও জলসংযোগগুলিকে অনুভবও প্রত্যক্ষ করতে পারি। এখানে দাঁড়িয়েই বোঝা যাবে, গঙ্গা পেরিয়েই পাঁশকুড়া থেকে উলুবেড়িয়া পর্যন্ত (এবং তারপর আরও পূর্বোত্তরে) সমতটের পথটি ভাগীরথীর উলুবেড়িয়া গতির দক্ষিণতীরে কিভাবে বিস্তৃত ছিল।

তারপর ঐ আষাঢ়ী বাঁধ থেকে উত্তরমুখী পথে প্রায় ১ মাইল এগিয়ে গেলেই পাওয়া যাচ্ছে 'দাবাদাড়ি' গ্রাম। ইতিহাস এখান থেকেই শুরু। দাবাদাড়ি—এই গ্রাম নামটির মধ্যে সম্ভবত 'দামস্থারী' কথাটিই মিলছে। উচ্চারণ পদ্ধতির স্বাভাবিক বিবর্তনের পথ ধরে 'দাম/দাব, এবং স্থারী/দাড়িতে রূপান্তরিত 'ম' কে' ব' ও 'র' কে' ড়'-উচ্চারণ বাংলা ব্যাকরণের এমনকি প্রাকৃতেরও অন্যতম বৈশিষ্ট। 'স্থারী' যে দাড়িতে পরিণত হ'তে পারে, তার দৃষ্টান্তও মিলছে পথের 'মঙ্গল দাড়ি' গ্রামনামে অর্থাৎ 'দাবাদাড়ি'র এই অর্থটি সার্থক এই স্থারপথে এগিয়ে গেলে তাম্রলিপ্তেই প্রবেশ করা যাবে। কারণ ইতিহাসের শেষ খবরে তাম্রলিপ্তকে আমরা 'দামলিপ্ত'—নামেই পেয়েছি।

এই পথে এগিয়ে গেলে মিলছে 'লোয়াদা' এবং তার পার্শ্ববর্তী কয়েকখানি গ্রাম। লোয়াদাই তাদের মধ্যমণি। একটি সাধারণ গঞ্জ, কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে অসাধারণত্বের ছাপ মিলছেই

আমাদের পূর্বপুরুষরা ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন এটি একটি আপ্ত অভিযোগ। কিন্তু আমরা বলতে চাই, তাঁদের ইতিহাস লেখার পদ্ধতি ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁরা ইতিহাস লিখতেন লৌকিক পদ্ধতির অনুসরণেই। আর সে পদ্ধতির প্রধান হাতিয়ার ছিল গ্রাম নাম বিন্যাস। এমনকি প্রত্ন নিদর্শনগুলিও তাঁরা গ্রাম নামের মাধ্যমেই বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে গেছেন। বিপুল অর্থব্যয়ে যত্রতত্র খোঁড়াখুঁড়ি করে যা মেলে না, গ্রাম নামের সার্থক বিশ্লেষণে তা মিলতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ইতিপূর্বেই আমরা মহেন্দ্রোদরো, কর্ণসুবর্ণকে পেয়েছি। এখানকার গ্রাম নামের উপর পরীক্ষা

চালিয়ে আমরা উদাহরণ বাড়াতে পারি। আমরা এ পদ্ধতিকে লৌকিক পদ্ধতিই (Nature Mathod) বলতে চেয়েছি।

লোয়াদাকে কেন্দ্র করে পাঁচটি গ্রাম মানখণ্ড, যতেবাড়, ঘুনঘুনি পাটনা, নবহরিপুর, ও তালবেড়িয়া পাটনা। এগুলিকে কেন্দ্র করেই যে বন্দরের কাজ চলত, তা এদের নাম থেকেই বোঝা যায়, 'মানখণ্ডে' মান বা পরিমাণ নির্ণীত হয়েই অনুমোদিত বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে 'লোয়াদা'র বা লৌহদ্বার পেরিয়ে ফতেবাড় ফৌতবাট-এর বিশাল বন্দর চত্বরে প্রবেশ করতেন বিদেশী বা স্বদেশীরণিকরা। লৌহদ্বার আজ 'লোয়াদায়' পরিণত—লৌহদ্বার—লোহাদার—লওয়াদা—লোয়াদা। আর বাণিজ্যকুঠীর বিশাল বাড়ীটি সম্ভবত কোন কারণে ফৌত বা ধ্বংস হয়ে 'ফতেবাড়ে' পরিণত; তবু আজও এখানেই হাটবাজার বসে। ঘুনঘুনি পাটনায় ঘনবসতি অঞ্চল, সম্ভবত এখানে বাস করতেন বন্দরের রাজপুরুষরা, আর নবহরিপুর রাজার (রাজধানী) পুর হ'লেও, আদি রাজবাড়ী এখানে নয়। এখানে ছিল হয়তো বিদেশীদের জন্য রাজ অতিথি শালা। সবার শেষে একান্তে 'তালবেড়িয়া পাটনা'য় ছিল পাটনা বা মৌর্য রাজধানী। অশোক এরকম 'পাটনা' রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পত্তন করতেন, ইতিহাস সে কথা বলেছে। 'তালবেড়িয়া' শব্দটির অর্থ সম্ভবত 'তালবাটিকা'। তাই আমরা বলতে চাই, 'তালবাটিকা-পত্তনে'র বিশাল ধ্বংসাবশেষের নীচে মৌর্য-রাজধানীকেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। হয়তো মহারাজ অশোক স্তূপ ও স্তম্ভ রচনার সময় এখানেই বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন।

এ প্রশ্ন হতেই পারে, পাটনা-নামটির মধ্যে ঐতিহাসিক স্মৃতির রেশ ধরা পড়লেও, 'তালবাটিকা'-নামটি কি ঐতিহাসিক ? বা তাম্রলিপ্তের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক ?

আমরা বলি, এপ্রশ্নের উত্তর দেবেন রাজদূত মেগাস্থিনিস এবং রাজসভা-রত্ন মহাকবি কালিদাস। খ্রীঃপূর্ব ৩০২ অব্দে মেগাস্থিনিস 'তাম্রলিপ্তকে বললেন 'তালুক্তি'বা তাল-উক্তি (taluctae), আর ৫ম শতাব্দীতে কবি কালিদাস বললেন 'তালীবন'। অর্থাৎ সুদীর্ঘ প্রায় আটশ বৎসরের ইতিহাস বলছে তাম্রলিপ্ত এবং তাল বা তালবন সমার্থক। আমরা কোন যুক্তিতেই এঁদের মত সাক্ষীকে অস্বীকার করতে পারি না সম্ভবত তাঁরা (দুজনেই) রাজ-সম্পর্কিত বলেই তাঁদের বক্তব্যে রাজধানীর নামটিই প্রাধান্য পেয়েছে। আমরা রাজধানীর অবস্থানকে চিহ্নিত করার মত সূত্র যুয়ান-চোয়াঙের বক্তব্যে মিলছে। তিনি উল্লেখ করেছেন, রাজধানীর অদূরেই মহারাজ অশোক নির্মিত, একটি বৌদ্ধ-স্তূপ ছিল। অতএব ঐ স্তূপটির খোঁজ নেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। ঐ ধ্বংসাবশেষ থেকে ১মাইলের মধ্যেই গয়েশপুর গ্রামের ধ্বংসস্তূপটিই সম্ভবত সেই ঐতিহাসিক বৌদ্ধ-স্তূপ। আমরা এবিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই চাই। অবশ্য গয়েশপুর (গয়া+ঈশ) এই নামের মধ্যে গয়াধীশ বুদ্ধের কথাই তো বলা আছে।

লোয়াদার জল বেষ্টনীর দক্ষিণে 'কাঁকড়া' গ্রাম। এখানকার অধিবাসীরা বলেন, কাঁকড়া গ্রামটি আগে ১০টি ভাগে বা 'পাড়ে' বিভক্ত ছিল। এখন মাত্র ৫টির নামই মেলে। সরকারী রেকর্ডে মাত্র চারটির নাম কাওয়া যায়—কাঁকড়া-আত্মারাম, কাঁকড়া-হরপ্রসাদ, কাঁকড়া- শিবরাম ও কাঁকড়া-মোহানপুর। কাঁকড়া-নোলগুড়ি নামে আরও একটি ভাগ এখনও সাধারণে পরিচিত।

এই গ্রামগুলিতে বেশ কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, দীর্ঘও প্রশস্ত রাস্তা এবং বড় বড় পুরাতন

পুষ্করিণী দেখা যাচ্ছে। পণ্ডিতদের মতানুসারে 'কাঁকড়া' শব্দের অর্থ 'কঙ্কবাটক'। 'ড়া'-এই অন্-আর্য প্রত্যয়টি সংস্কৃত 'বাটক' শব্দেরই দ্যোতক। (২) এবং কঙ্ক—কাক, যেমন বঙ্ক—বাঁক বা শঙ্খ—শাখ ইত্যাদি। প্রশ্ন আসে 'কাঁকড়া' শব্দের অর্থ বা মৌলিক শব্দ 'কঙ্কবাটক' হতে পারে, কিন্তু এর সঙ্গে আত্মারাম, হরপ্রসাদ প্রভৃতি নামযোগের অর্থ ? এগুলির মধ্যে কি কোন ইঙ্গিত আছে ?

উত্তরে আমরা বলতে পারি, কেবলমাত্র প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, দীর্ঘ-প্রশস্ত রাস্তা বা পুরাতন পুষ্করিণী নয়, ঐ সংযুক্ত নামগুলিও এখানকার মাটিতে নগর-অস্তিত্বের আভাসই দিচ্ছে। আধুনিক যে কোন শহরের রাজপথ বা মহল্লাগুলি যেমন কোন না কোন স্মরণীয় ব্যক্তির নামেই চিহ্নিত, তেমনই সেদিনের এই লুপ্ত নগরীর মহল্লাগুলি হরপ্রসাদ, শিবরাম প্রভৃতি স্মরণীয় পুরুষদের নাম দিয়েই চিহ্নিত ও পরিচিত ছিল। এবং এর মাধ্যমে তাম্রলিপ্তের উন্নত সংস্কৃতির পরিচয়ই প্রকটিত। আর আমরা সেই ট্র্যাডিশনই সমানে বহন করছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, পরিব্রাজক যুয়ান-চোয়াঙের বর্ণনায় তদানীন্তন তাম্রলিপ্তে ১০টি বৌদ্ধ-বিহার ছিল, এবং পরবর্তী পরিব্রাজক ইৎ-সিঙের আমলে যেগুলির সংখ্যা কমে গিয়ে ৫৬টিতে দাঁড়িয়েছিল। এখানেও ১০ কাঁকড়ার ৫ কাঁকড়ায় পরিণতিটি যেন তাঁদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। এই ঘটনাটিকে কি কাকতালীয় বলেই অস্বীকার করা যায় ? তাই আমরা বলতে চাই, যুয়ান চোয়াঙের আমলে, ঐ ১০ কাঁকড়ার ১০টি বৌদ্ধ-বিহারকে কেন্দ্র করেই তাম্রলিপ্তের নগর অস্তিত্বটি রচিত ছিল, আর ইৎ-সিঙের আমলের ৫৬টি বিহারের শেষ পরিণতি বর্তমান কাঁকড়ার শ্রীহীন গ্রামগুলিই।

যুয়ান চোয়াঙের বিবরণে আমরা তাম্রলিপ্ত নগরের আর একটি বিশেষ ইঙ্গিত পেয়েছি। তিনি বলেছেন, নগরপ্রান্তেই ছিল প্রায় ২০৫ ফুট উচ্চ অশোকস্তম্ভটি। কাঁকড়া বা কঙ্কবাটক যদি তাম্রলিপ্তনগর হয়, তবে এর যে কোন প্রান্তেই হোক অশোকস্তম্ভের অবস্থানটি অবশ্যম্ভাবী কাঁকড় গ্রামের এক দেবী কাঁকড়াচণ্ডীর উৎস অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা বোধ হয় অশোকস্তম্ভেরই সন্ধান পাচ্ছি।

শোনা যায়, কোন এক সময় কাঁকড়া গ্রামে একটি চণ্ডী মন্দির ছিল। ঐ মন্দিরটি বর্তমান অধিবাসীদের কেউই দেখেন নি। গ্রামবৃদ্ধরা কিছু কিছু হুড়ি দেখেছেন মাত্র। এক সময় পাশেই একটি পুকুর কাটতে গিয়ে পাওয়া যায় নকসাকাটা একটি অদ্ভুত কালো পাথরের বড় টুকরো। লোকেরা ভাবলেন ইনিই সেই মন্দিরের চণ্ডীদেবী। গ্রামের নামেই নামকরণ হল 'কাঁকড়াচণ্ডী' পুজোও শুরু হল। এ ঘটনাটি বেশী দিনের নয়।

পদ্মপাঁপড়ির অপূর্ব নকশাকাটা ঐ পাথরের টুকরোটি প্রকৃতপক্ষে চণ্ডাশোক নির্মিত মন্দির বা স্তম্ভের ভগ্নাংশ বলেই মনে হয়। এটি কোন দেবীমূর্তিই নয়। খুব সম্ভব তাম্রলিপ্তে 'চণ্ডাশোক' নামেই অশোকের পরিচিতি। কলিঙ্গ যুদ্ধের দুঃখময় স্মৃতিই হয়তো তার কারণ। তাই তাঁর তৈরী মন্দির 'চণ্ডামন্দির নামেই সাধারণে প্রচারিত হয়। আবার কালের ব্যবধানে চণ্ডা চণ্ডীতে রূপান্তরিত হয়ে অবশেষে কাঁকড়া চণ্ডীতে পরিণত ঐ মন্দিরের (লুপ্ত) স্থানটি কাঁকড়ার প্রান্তেই অবস্থিত।

অর্থাৎ 'তালবাটিকা' যেমন ছিল রাজধানী বা রাজবাড়ীর নাম, তেমনই 'কঙ্ক বাটক' ছিল তাম্রলিপ্ত-নগরের আদরের ঘরোয়া নাম। আর সমগ্র এলাকাটিই 'দামলিপ্ত' এই সাধারণ নামেই

পরিচিত হত সন্দেহ নাই। তাই আজও বিকৃতভাবে হলেও, 'দাবাদাড়ি' 'দামন্বারে'র ভূমিকাই পালন করছে, এবং বলছে, 'Welcome to (Dabadari) Damalipta.

এই অবসরে আমরা আমাদের পাওয়া কংসাবতী তীরে তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধ-ধর্মের সন্ধান নিতে পারি। জৈন গ্রন্থ ভাগবতী সূত্রের তামলী আখ্যায়িকার বর্ণনা অনুসারে তাম্রলিপ্তে কেবলমাত্র বৌদ্ধ-অস্তিত্ব ছিল না, এখানে খোদ মৌর্যবংশীয় সন্তানদেরই বসবাস ছিল, এবং সেটি রাজধানীকে কেন্দ্র করেই। 'চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা যেই হউন, পালি মহাপরিনির্বাণসূত্রে দেখা যায় পিপ্পলীবন নামক স্থানে মোরিয় নামক ক্ষত্রিয়গণ ছিল, তাহারা শাক্যমনির চিতাভস্মের হিস্বা পাইয়া তাহার উপর স্তূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ভাগবতীসূত্রের তামলী আখ্যায়িকা সপ্রমাণ করে প্রাচীন তামলিত্তী নগরীতেও মোরিয় বংশের গৃহস্থের বসবাস ছিল। যদি বৌদ্ধমতই ঠিক হয় তবে পাটলীপুত্রের মৌর্যবংশের সহিত তামলিত্তির মোরিয় পুত্রগণের সম্বন্ধও ছিল বলা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দের উপরিউক্ত বক্তব্য এখানকার ঘটনাবলীর উপর আলোকপাত করেই। (৫)

'ময়ূরকুলোৎপালিনী বনলাশক' বংশের সন্তান চন্দ্রগুপ্ত তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম মৌর্য। অর্থাৎ ময়ূরের সঙ্গে মৌর্যবংশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। লোয়াদা অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি মন্দিরশীর্ষেই তাম্রনির্মিত ময়ূর বর্তমান। আবার এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ 'ময়রা'দের একটি প্রধান শাখা 'মৌড়'। বলাবাহুল্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে মৌড় শাখাটির মৌলিক রূপ 'ময়ূর'। (ময়ূর—মউর—মৌড়) অর্থাৎ ময়রাদের সঙ্গেও ময়ূরের সম্পর্কেও ঘনিষ্ঠ। এবং সম্ভবত ময়রা শব্দটিও মূল মৌর্য বা ময়ূর থেকেই উৎপন্ন। সংস্কৃত 'মোদক' শব্দ 'ময়রা' নামের প্রকৃতি হিসেবে একান্তই অবাস্তব, অর্থাৎ মৌর্য—মোরিয়া—ময়রা—মৌর্যদের বংশধরগণ এরূপ একটি ব্যবহার থেকে উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

তাই আমরা বলতে চাই, ময়রারা কেন এত অধিক সংখ্যায় লোয়াদায় বাস করেন, কেন তাঁদের মন্দিরগুলি ময়ূর-লাঞ্ছিত কেন তাঁরা লোয়াদাকে তাঁদের তীর্থরূপে সম্মান করেন। এবং তাঁদের 'মৌড়' শাখার নিহিতার্থ কি—এসবের মধ্যেই লোয়াদার সঙ্গে ময়রাদের তথা তাম্রলিপ্তের সঙ্গে মৌর্যবংশের সম্পর্কের একটি নির্দিষ্ট ইঙ্গিত মেলেই। সম্ভবত তাই বুদ্ধপূর্ণিমার পুণ্য তিথিটিতে বাংলার তাবৎ জাতময়রারা লোয়াদার পবিত্র ভূমিতে সমবেত হয়ে ব্রহ্মাপূজার অনুষ্ঠান করেন, সেটি বাংলার অন্য কোন স্থানের মাটিতে সম্ভব নয়।

বলা যায় ময়রারাই কংসাবতীতীরে তামলিপ্তের জীবন্ত প্রত্ন নিদর্শন। তথাপি এমন কিছু প্রত্ন-বস্তু আজও লোয়াদার মাটির উপরে মিলছে যা তাম্রলিপ্তের পরিবেশে মানায়। মন্দির টেরাকোটায় এক বৌদ্ধ-গুরুর কাছে আশ্রয় নিচ্ছেন এক নব ভিক্ষুণী, আর পাশে অপূর্ব ভিক্ষুণীবেশে দণ্ডায়মানা দুজন ভিক্ষুণী তা অনুমোদন জানাচ্ছেন। আর একটি প্রায় তিন ফুট দীর্ঘ পুষ্পচয়নরতা ভিক্ষুণীমূর্তি অপূর্ব সুষমায় হাস্যমুখী। একটি গাছের তলায় একটি পাথরের উপর বিপরীতক্রমে ত্রিকোণ, বৃত্ত ও চতুষ্কোণ অঙ্কিত। এটি সম্ভবত বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের পাত্র-স্থাপন যন্ত্র। এ ছাড়াও দেখা যায় কিছু বাণিজ্য তরণীর টেরাকোটা ও বিদেশী বণিকদের পোড়ামাটির ফলক, অর্থাৎ বহির্বাণিজ্যের স্মৃতি এখনকার শিল্পীরা আজও মৃত্যুহীন করে রেখেছেন। পরিশেষে বলি, কংসাবতীতীয়ে চন্দ্রামেড়ের বিশাল ধ্বংসাবশেষ থেকে 'লক্ষ্মী-লাঞ্ছিত' গুপ্ত যুগীয় স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান এবং পার্শ্ববর্তী গোলগ্রামের পথপ্রান্তে বিচিত্র ধরণের কৌলাল

এখানকার সম্ভাবনাকে প্রত্যয়িত করছে। আর চন্দ্রামেড়ের ধ্বংসাবশেষটি সম্ভবতঃ ঈৎ-সিঙ অধ্যুষিত ভ-ব-হ বিহারেরই অবশেষ।

(১) নীহাররঞ্জন রায়—বাঙালীর ইতিহাস,) তৃতীয় সংস্করণ) পৃঃ ৯৬-১০৯ ;
(২) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—৬৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (১৩৬৫) পৃঃ ২৮১ ;
(৩) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী—কবিকঙ্কণ চণ্ডী (বসুমতী প্রাঃ লিঃ, ১৩৭০) পৃঃ ১৮২ ;
(৪) শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু—মেদিনীপুরের ইতিহাস (১৩৪৬) পৃঃ ২৬১ ;
(৫) রমাপ্রসাদ দে—মেদিনীপুরের সাহিত্য সম্মেলনে ৮ম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণের অংশ—'মেদিনীপুরের ইতিহাস' যোগেশচন্দ্র বসুর উদ্ধৃতি পৃঃ ৩১১-৩১২ ;
তাছাড়া স্থানীয় পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য বহু প্রচলিত ইতিহাস থেকেও কিছু তথ্য নেওয়া হয়েছে।

জনশিক্ষায় লোকবৃত্ত

শঙ্কর সেনগুপ্ত

লোকসাহিত্যে অন্যতম প্রধান অংশ ছড়া। অতি সংক্ষেপ বর্ণনায় ছড়া ত্বরিত চিত্র আনে। বাস্তববোধ ও বুদ্ধির বিকাশ হয়। একটা অবজেক্‌টিভ প্রসঙ্গ বা ষ্টাইল প্রকাশ পায়। তাই ছড়ার শব্দগঠনের মধ্যে খেয়ালখুশি ভাবালম্বন চলে না। শব্দে শব্দে মিল রচনা করতে করতে ছড়ার কথা বেড়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেকটি ছড়ারই একটা লক্ষ্য থাকে। তাই ছড়াকে অসম্পূর্ণ সৃষ্টি হিসাবে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। যদিও এর সাহিত্যিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর হতে পারে।

ছড়ার মধ্যে সহজ ঘরোয়া দিক যেমন আছে তেমন আছে বহু থওচিত্র। লোকজীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ছড়ার উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি। অর্থাৎ ছড়া জীবনভিত্তিক রচনা। পরিবর্তিত অবস্থায় জীবনের মানোন্নয়ন ও পরিবেশের বিবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। উন্নয়নের ধাক্কায় বহু পুরাতন জিনিষ বর্জিত হয়। নতুন নতুন শব্দসম্ভারের আগমন হয়।

লোকজীবনের নানাদিকে লোকবৃত্তের ভূমিকা বিদ্যমান। লোকশিক্ষা ও জনযোগাযোগের অন্যতম বিশিষ্ট মাধ্যম হিসাবে লোকবৃত্ত নানাদিকে স্বীকৃতি পাচ্ছে। সুখী জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে লৌকিক জ্ঞান বা উপদেশ কি ভাবে লোকজীবনকে মাতিয়ে রাখে তা অনুধাবনের নিমিত্ত নিম্নে কয়েকটি ছড়া উদ্ধৃত করছি। উদ্ধৃত ছড়ার প্রথম ও দ্বিতীয়টি একটি অপরটির পরিপূরক। উভয়ের বক্তব্য প্রায় এক হলেও কিছু কিছু ভিন্ন তথ্যও বিদ্যমান। ছড়া দুটি বিভিন্ন পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থায় সৃষ্ট। সামাজিক ও পরিবেশ অবস্থাভেদে একই ছড়া কি ভাবে দেয়া-নেয়া করে এগিয়ে যায় এই ছড়া দুটি তারও উদাহরণ। ছড়া দুটিতে বলা হয়েছে কি কি কাজ বা আচরণ করলে সুখীজীবন গড়ে তোলা যায় তার কথা। প্রথম ছড়াটি এইরূপ—

আহাম্মক এক, ছোট হইয়া বড়র সাথে যে দেয় ঠেক।
আহাম্মক দুই, ঘর বাঁধিয়া যে না ধরে টুঁই।
আহাম্মক তিন, বড় হইয়া ছোটের কাছে যে করে ঋণ।
আহাম্মক চাইর, ঘরের কথা যে করে বাইর।
আহাম্মক পাঁচ, সীমানার কাছে যে লাগায় বাঁশ।
আহাম্মক ছয়, পরের কথা না বুঝিয়া যে করে হয় হয়।
আহাম্মক সাত, গলাতক ভরিয়া যে খায় ভাত।
আহাম্মক আট, বিনা লাভে যে করে কষ্ট।
আহাম্মক নয়, গোপন কথা যে লোকের কাছে কয়।
আহাম্মক দশ, যার থাকে নেশার বশ।
আহাম্মক এগারর, কথা বলব কি।
নিজ গাঁয়ে যে বিয়া দেয় আপন ঝি॥

কেউই আহাম্মক হতে চায় না। সকলেই এই উপদেশ মত নিজেদের চালনা করে। আর তাতে সংসারের সুখশান্তিও অটুট থাকে। তবে অর্থনৈতিক কারণে যে অশান্তি অভাব অনটনজনিত যে দুঃখ ক্লেশ, তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে, নিজের বোকামির জন্য বা নিজের সৃষ্ট অশান্তির অনলে দগ্ধ হতে না হয় তার জন্য সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ। পূর্ব বাঙলার ময়মনসিংহ জেলায় এই ছড়াটি যখন পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ায় চলে এল তখন পরিবেশ ও ভিন্ন সমাজ পরিস্থিতিতে কিছু যোগ বিয়োগ লক্ষ্য করি। ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য নিম্নে নদীয়া জেলার প্রাপ্ত ছড়াটি তুলে ধরছি—

আহাম্মক এক, যে খালি রাখে ট্যাঁক।
আহম্মক দুই, যে চালে তোলে পুঁই।
আহম্মক তিন, যে আপনার ধন পরকে দিয়ে নিজে করে ঋণ।
আহাম্মক চার, যে পরের ঘষে মাথা দিয়ে, আপনি খায় মার।
আহাম্মক পাঁচ, যে পরের পুকুরে ফেলে মাছ।
আহাম্মক ছয়, যে পরের কথায় রয়।
আংহাম্মক সাত, যে শ্বশুরের খায় ভাত।
আহম্মক আট, যে বৌ-ঝিকে পাঠায় হাট।
আহাম্মক নয়, যে ঘরজামাই হয়।
আহম্মক দশ, যে মাগের হয় বশ।
আর আহাম্মক কারে কয়, যে আপন স্ত্রী ত্যাজ্য করে বেশ্যালয়ে রয়।
আর আহাম্মক কারে বলি, যে পরকে দেয় গালি।
আহাম্মক কারে বলে, যে তোষামোদে ভোলে।
আহাম্মকের বাবু, যে অসৎ লোকের কথায় মজে খায় হাবুডুবু।
আহাম্মক অতি, নিজ স্বার্থ তরে করে অপরের ক্ষতি।
আহাম্মকের সেরা, সদা কয় মিথ্যা কথা হিংসায় পেট ভরা।
আহাম্মক অতিশয়, নিজ ধর্ম ত্যাগ করে পরধর্মে যায়।
আহাম্মক যে হয়, পরের ঘরে বাস করে আফশোষে প্রাণ যায়।
আহাম্মকের শেষ, যার সদাই মলিন বেশ।
আহাম্মকের কথা হইল যে শেষ।
মেনে যদি চল শিক্ষা হইবে বিশেষ।

ময়মনসিংহের ছড়াদার যে যে কারণে আহাম্মক চিহ্নিত করেছেন, নদীয়ার ছড়াদার তার চেয়ে আরও অনেক বেশী কারণে আহাম্মকদের শ্রেণীচিহ্নিত করেছেন। দুটি বিভিন্ন পরিবেশ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক ছড়া দুটি অনায়াসে শিক্ষিত ও শহরের মানুষকে নাড়া দিতে সক্ষম। উপস্থাপনার ঢঙ ও বক্তব্য এতই স্পষ্ট যে টীকা-টিপ্পনী দিয়ে অর্থ বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন দেখি না। প্রথম ছড়াটির চেয়ে দ্বিতীয় ছড়াটি অর্বাচীন। দ্বিতীয় ছড়ায় কিছু শহরের বাতাস লক্ষ্যণীয়। তাই এখানে মিথ্যা কথা, হিংসা, ধর্মত্যাগ,

বেশালয় গমন, মলিন বেশ পরিধান না করা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আহাম্মকদের নিয়ে একসঙ্গে বসবাস করা বিরক্তিকর। তারা নানাভাবে তিক্ততার সৃষ্টি করে। তাই বুদ্ধিমান মানুষ সর্বদাই তাদের এড়িয়ে চলেন বা চলতে চান। অনবধানতাবশত কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আহাম্মকে পরিণত না হয় তার জন্য এই সতর্কবাণী।

শুধু আহাম্মকেরা কেন আরও নানাভাবে তিক্ততার সৃষ্টি হতে পারে। একজনের আচরণের দ্বারা অন্যে তিক্ত না হয় তা খেয়াল রাখার জন্য ছড়াদার সাবধানবাণী শুনিয়েছেন। বলেছেন, যে কাজ শোভন নয়, শালীন নয়, তা তিক্ত। এই তিক্ততা কি ভাবে বেড়ে যায় ছড়াদার তারও একটি তালিকা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে—

তিক্ত বড়—মিথ্যা কথায় নিজ দোষ ঢাকা।
তিক্ত বড়—স্বামী-স্ত্রীতে সর্বদাই থাকা।
তিক্ত বড়—কুলনারীর নাটক-নভেল পড়া।
তিক্ত বড়—কুলবধূর গানবাজনা করা।
তিক্ত বড়—নীতিকথা আহাম্মকের কাছে,
তিক্ত বড়—গুণীর বিচার অগুণীর কাছে।
তিক্ত বড়—পরনিন্দা পরের কথায় থাকা,
তিক্ত বড়—বৃথাবাক্য অতিশয় বকা
তিক্ত বড়—পেটে ক্ষুধা মুখে লম্বা কথা।
তিক্ত বড়—পরের অন্নে পেট ছেড়ে মরা,
তিক্ত বড়—হৃদে বিষ মুখে মধুর বাণী।
তিক্ত বড়—নিজগুণ নিজেই বাখানি।
তিক্ত বড়—আত্মীয়-স্বজন সঙ্গে বাদ,
তিক্ত বড়—স্বজন ত্যজি শ্বশুরকুলে টান।
তিক্ত বড়—কাঁদায়ে মাকে শালীর মুখে পান।
তিক্ত বড়—পতিনিন্দা যেই নারী করে,
তিক্ত বড়—স্বামী ত্যজি ভাইকে আদর করে।
তিক্ত বড়—ঘন ঘন শ্বশুরবাড়ী যাওয়া,
তিক্ত বড়—কুলবধূর লজ্জাহীনা হওয়া।
তিক্ত বড়—স্বার্থতরে খোসামোদ করা
তিক্ত বড়—চোখ থাকতে নাকে চশমা পরা।
তিক্ত বড়—কৃপণের ধনের গরব করা।
তিক্ত বড়—আত্মসুখীর বৃথা জীবন ধরা।
মিষ্টি বড়—উপকথা কহিহ বিশেষ,
মেনে যদি চল সুখ পাইবে অশেষ।

এই ভাবে লোকসমাজে শাসন, শিক্ষা ও নির্দেশ দেয় লোক কবি। তার এই নির্দেশ বা শিক্ষায় কাজ হয়। সামাজিক মানুষ এই ধরণের শিক্ষা বা নির্দেশকে বিশেষ মর্যাদা দেয়। অমান্য করে এগোতে ভয় পায়। এটা কি কম কথা!

বলাবাহুল্য, ছড়া বা লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপকরণের ভিতর সাহিত্যের স্বাদ যাঁরা পেতে চান তাঁরা কিছুটা নিরাশ হবেন। লোকসাহিত্যে সাহিত্য মূল্য গৌণ। কিন্তু সামাজিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্যচেতনা, চিরন্তন ভাবনা, নির্ভেজাল আমোদ স্ফূর্তি, বুকফাটা কান্না প্রভৃতি সংস্কৃতি বিষয়ক ধারণা, সহজ সরল জীবনের ছবি, ইতিহাসের উপকরণাদি ও রচনার মধ্যে একটা স্বকীয় চরিত্র, একটা ষ্টাইল, একটা অবয়ব, আঙ্গিক বা ষ্ট্রাকচারও দুর্লভ নয়। তাই লোকসাহিত্য লোকবিজ্ঞানীর অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের বিষয়, লোক সাহিত্যের সাহিত্যিক মূল্য বিচার লোকবিজ্ঞানীর কাজ নয়।

লোকবিজ্ঞানী লোকবৃত্ত নিয়ে চর্চা করেন, অধ্যয়ন-অনুশীলন, বিশ্লেষণ ও শ্রেণীচিহ্নিত করেন লোকজীবনকে জানতে, লোকসমাজকে বুঝতে এবং ঐতিহ্য ও প্রাচীন মূল্যবোধ সম্পর্কে সমাকরূপে অবহিত হতে। লৌকিক জ্ঞান অর্থাৎ লোকসমাজের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড, আচার অনুষ্ঠান, মেলাখেলা, নাচগান ছাড়া, অভিনয়ের সৌরভের দ্বারা সমগ্র সমাজকে মাতিয়ে রাখতে তাই তৃতীয় দুনিয়ার প্রচার ও জনযোগাযোগ বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা উঠেপড়ে লেগেছে। লৌকিক মাধ্যম সমূহকে প্রচার ও জনযোগাযোগের কাজে ব্যবহার করতে। সিনেমা, বেতার, দূরদর্শনে নানা ধরণের লৌকিক অনুষ্ঠানের ছড়াছড়ি। অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়কে না বুঝে বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি চলেছে যা হয় আহাম্মকী কাজ অথবা তিক্ত। আধুনিক ছড়াদারদের আহাম্মক ও তিক্ত বিষয়ক ছড়ায় এই চিন্তারও প্রতিফলন ঘটবে তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

উত্তরবঙ্গের প্রবাদ ও ছড়ায় লোকশিক্ষা

পবিত্রকুমার গুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের যে অংশের দক্ষিণে অধুনা বাংলাদেশ, গঙ্গা ও পদ্মানদী, পশ্চিমে বিহার, উত্তরে হিমালয় এবং পূবে আসাম ও বাংলাদেশ তাকেই চলতি কথায় আমরা উত্তরবঙ্গ বলি। পাঁচটি প্রশাসনিক জেলা উত্তরবঙ্গের মধ্যে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ। জেলাগুলি জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। পাগলা, কালিন্দী, মহানন্দা, আত্রেয়ী, পূর্ণভবা, কুলিক, করতোয়া, তিস্তা, জলঢাকা, তোর্ষা, কালজানি, রায়ডাক, সংকোশ প্রভৃতি অসংখ্য নদনদী বিধৌত উত্তরবঙ্গ। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং, মিরিক, ঝালং, জয়ন্তীয়া, বক্সাদুয়ার, ভোটানঘাট, ইত্যাদি শৈল শহর ও সানু দেশের সৌন্দর্য ও ধ্যানময় গাম্ভীর্য উত্তরবঙ্গের একটি সৌম্যমূর্তি। আবার বৈকুণ্ঠপুর, গরুমারা, জলদাপাড়া, চিলাপাতা, নীলপাড়া, রাজাভাত খাওয়ার সবুজ গহন অরণ্যানী উত্তরবঙ্গে তাজা সবুজ সরল ও উন্নত প্রাণের প্রতীক। এরই পাশাপাশি কমলা, চা, আনারসের বাগিচা। দিগন্ত বিস্তৃত সোনালী ধানের ক্ষেত। পাট ও তামাকের ক্ষেত। সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের রূপ অপরূপ।

হাজার হাজার বছরের নানা মানব স্রোতের বিচিত্র সঙ্গমে উত্তরবাঙলায় গড়ে উঠে এক বিশিষ্ট সংস্কৃতি। রাভা, মেচ, টোটো ভুটিয়া লেপচা, গারো প্রভৃতি কিরাত মানবগোষ্ঠী উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে, জঙ্গলে, নদীর ধারে বসতি স্থাপন করে মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির পত্তন করে। রাজবংশী ক্ষত্রিয় ধারা এই সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে।

আবার চা শিল্প ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ছোটনাগপুর, সাঁওতাল, মালাপাহাড়ী, মুণ্ডা, আসুর প্রভৃতি উপজাতি চলে আসে তরাইয়ের জঙ্গলে ও ডুয়ার্সের চা বাগিচায়।

দুটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারার মধ্যে হোল মিলন, মিশ্রণ। সময়য়ের মধ্যে জন্ম নিল নোতুন সংস্কৃতি। সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধ, ইসলাম, শৈব, বৈষ্ণব ও খৃষ্টীয় ধর্মের পাশাপাশি এখানে দীর্ঘদিন প্রাণবাদ (animism) অনুসৃত হয়েছে। আজও মেচ, রাভা, গারো, টোটো ও রাজবংশীদের মধ্যে প্রাণবাদ লক্ষ্য করা যায়।

সহজ সরল সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত উত্তর বাঙলার মানুষ। দুঃখের অনলে, দুর্গতির অন্ধকারে দুশ্চিন্তায় অবসন্ন প্রায়। অথচ এরাই উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফাঁকে ফাঁকে ক্লান্ত দেহকে শান্ত করার জন্য, দারিদ্রকে স্বাভাবিক করে নেওয়ার জন্য, হতাশা থেকে আশায় পৌঁছানোর সঞ্জীবনী মন্ত্র হিসাবে কখনও সচেতনভাবে রচনা করে ফেলেছে লোকসাহিত্যের বিপুল সম্ভার। প্রবাদ ও ছড়া তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লোক শিক্ষার অব্যর্থ হাতিয়াররূপে প্রবাদ ও ছড়ার জুড়ি মেলা ভার। সর্বকালের সর্বদেশের সেরা শিক্ষা বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ প্রবাদ ও ছড়াকে শিশু মনের বিকাশ ও প্রকাশে ব্যবহারের কথা বলেছেন। মানবজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বাগভাণ্ডার হোল প্রবাদ। অল্প কথায় সূত্রে আকারে কিংবা পদ্যের আকারে ছোট ছোট শ্লোকে রচিত হয় প্রবাদ। প্রবাদ খুবই

শ্রুতিমধুর। অর্থপূর্ণ বাক্য। সহজেই মনে রাখা যায়। ছেলেবেলায় শোনা প্রবাদ বুড়ো বয়সেও মনে থাকে।

প্রবাদ দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ হাসিকান্নার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, জীবনের ভালোমন্দ, সততা-অসাধুতা, সেবা-বঞ্চনা, ভালোবাসা-প্রতারণা, আচার-ব্যবহার সবকিছুই প্রবাদে প্রতিফলিত। জীবিকার সূত্রে কৃষি, শিল্প কোন কিছুই প্রবাদের বাইরে নয়। নীতিকথা, উপদেশ, সতর্কবাণী—সব কিছুই প্রবাদে প্রতিফলিত। প্রবাদ লোকসমাজের সৃষ্টি। এর প্রয়োগ ও ব্যবহার লোকসমাজের প্রয়োজনেই। জীবনধারা পরিবর্তনের সাথে সাথেই প্রবাদেরও পরিবর্তন ঘটে। পুরাতন সমাজে অপ্রয়োজনীয় প্রবাদ বাতিল হয়ে যায়। যুগের উপযোগী প্রবাদ তৈরী হয়। জীবন ও সমাজের সার্বজনীন সত্য মূর্ত হয়ে উঠে প্রবাদে। লোকশিক্ষায় প্রবাদ অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন।

ছড়ার জন্ম নারী ও শিশুর ভাষায়। সাহিত্যের আদিম ছন্দই ছড়া। ছড়ার ভাষা সহজ ও অকৃত্রিম। ছড়া মনে রঙ ধরায়। স্বপ্নের জাল বোনে। ভাবনা ও কল্পনার এক নোতুন জগতে নিয়ে যায় শিশুকে। শিশু কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতীয় মানসচিত্রে রূপ পায় ছড়ায়। আনন্দ ও বেদনায় ভরা ছড়া। ছড়া অসংলগ্ন টুকরো টুকরো বাক্য। অসম্পূর্ণ চিত্র। তাই পরবর্তীকালে সম্প্রারিত হয়ে উঠে স্বজনাত্মক কল্পনাশক্তিতে। ভাষা শিক্ষা জনশিক্ষার প্রধান সোপান। ছড়ার মাধ্যমে খুব সহজে ভাষা শেখা যায়। নতুন নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচয় হয়। অচেতনভাবে ছন্দের সঙ্গেও পরিচয় ঘটে শিক্ষার্থীর।

উত্তরবঙ্গের কিছু প্রবাদ তুলে ধরা যাক :—

ফুটানি রামা
উপরে ধুতি তলে জামা ॥

ধুতির উপরেই জামা পড়তে হয়। বাহাদুরী করে বিপরীত করলেই লোকে হাসে। বাহ্যিক আড়ম্বরকে এখানে নিন্দা করা হয়েছে।

বৈদ্যের কাম্ভলা মাও
কামারের ঘ্যাচকাটা দাও
ছকর বন্দের ভিজে মাথা
তাঁতীর ছাওয়ার গালাত ক্যাথা ॥

বৈদ্য সবার রোগ সারান অথচ নিজের মা-ই কাঁশরোগে মরে। কামার সবাকার দা তৈরী করেন। নিজের দা-এ শান দেবার সময় জুটে না। ঘরানী পরের চাল মেরামত করে। বর্ষাকালে নিজের চাল দিয়ে জল ঝরে। অন্যের বস্ত্র বুনতে বুনতেই তাঁতীর সময় চলে যায়। তাঁতীর ছেলের সম্বল ছেড়া কাঁথা। এখানে নিজের ঘর আগে সামলানোর উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

বাড়ীর শোভাংকর কলাগাছ নারিকেল
চালির শোভা হইল ঝারি
নারীয় শোভাংকর নোয়ামী পরিজন
বিছিনার শোভা হইল নারী ॥

বাড়ীর শোভা খোলে উচু নারকেল গাছে। নলযুক্ত জলপাত্রে বারান্দা সুন্দর দেখায়। নারীর শোভা স্বামী। শয্যার শোভা নারী। স্বামী ও তার পরিজনদের সুখী করতে পারলেই নারীর সৌন্দর্য সর্বাধিক খোলে।

বাপমার আশুরবাদ
খা বাছা দিউ ভাত ॥

পিতামাতার আশীর্বাদই সন্তানের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

বাপের থাকি বেটা-এ পিয়ান্
পুছি পুছি নেয় গিয়ান ॥

সমাজের গতিশীলতার জন্যই পিতার থেকে পুত্রের, গুরুর থেকে শিষ্যের বেশী বড় হওয়া দরকার। শাস্ত্রে তাই পুত্র ও শিষ্যের নিকট পরাজয় বরণ করাকে অভিনন্দন জানান হয়েছে।

বাড়র বুড়া
গাছের মুড়া ॥

এখানে বৃদ্ধদের অভিজ্ঞতার মূল্যের কথা বলা হয়েছে। পুরানো বুড়ো গাছের শিকড় মাটির ভিতরে। ভূমিক্ষয় রক্ষা করে! পথিককে ছায়া দেয়। বৃদ্ধের জীবনে নানাবিধ অভিজ্ঞতা। তার উপদেশে তরুণরা অনেক লাভবান হয়।

বাঘ দেখিলে পাছায়
বিলাই দেখিলে আগায় ॥

শক্তের ভক্ত নরমের যম। এই সত্যটিকে এখানে সুন্দর করে বলা হয়েছে। উৎপীড়ককে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে।

অন্তনে অন্তনে গোটা
পিয়াজি ফেরকেটা ॥

রসুনের কোয়াগুলি একত্রীভূত। পিঁয়াজের কোয়া বিচ্ছিন্ন। একই বংশ বা গোষ্ঠীর বন্ধন দৃঢ়। অন্যত্র তা শিথিল।

অকর্মার তাঁও বড়
দারিদ্দার খিদে বড় ॥

শ্লেষ মিশ্রিত ভর্ৎসনা করা হয়েছে এখানে। অলসের রাগ ও গরীবের ক্ষুধা বেশী।

আশা সে পরম দুখ্
নিরাশা পরম সুখ ॥

আশা ও নিরাশা দুইই সমান। এভাবে চলতে যে জানে সুখ ও শান্তি তার হাতের মুঠোয়।

আগধা-এয়া বান্দে আলি
তা এ খায় শোল বোয়ালি ॥

উত্তরবঙ্গে বর্ষাকালে ধানক্ষেতে মাছ জন্মে। বৃষ্টির শেষে মাছ স্রোতের টানে নদীর দিকে চলে যেতে থাকে। বুদ্ধিমান কৃষক বর্ষার শুরুতেই ক্ষেতে উচু আল বাঁধে। এবং ইচ্ছামত মাছ ধরে খায়।

অর্থাৎ সময় মত যত্ন না নিলে পরে পস্তাতে হয়!

আঁগিনা নষ্ট করে ছিম্ ছিম্ পানি
ঘর নষ্ট করে কান ভাঙানী ॥

ঝির ঝির বৃষ্টি উঠান নষ্ট করে। কান ভাঙানীরা নষ্ট করে ঘরের শান্তি। ভাঙানী অর্থাৎ খল ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করতে নেই।

আঁড়িয়া গরুর চাষ
চোরার গৃহ বাস ॥

অভিজ্ঞতা একদিনে হয় না। প্রথম প্রথম ভুল হবেই।

আলমিয়াও নড়িল
দেওয়াও ঝড়িল ॥

অলস ব্যক্তি কাজ না করার ছুতা সবসময়ই আবিষ্কার করে।

নিজ বুদ্ধিত রাজা
পর বুদ্ধিত ফকির ॥

নিজের বুদ্ধিতে চলেই জীবনে জয়ী হওয়া যায়। অন্যের বুদ্ধিতে সর্বনাশ হয়।

আম পাকিলে মিঠা
মানসি পাকিলে তিতা ॥

বয়স বাড়লে মানুষ একটু খিটখিটে মেজাজের হয়।

উজান ভুঁই যার
মাটি মাল্লি তার ॥

প্রবাদটি কৃষি জমির সত্ব বিষয়ক। উজান জমির মালিকই আল বাঁধেন। তিনিই মালিক।

একে পাতে খাই
তোর ক্যানে গায়ে ছম ছম ?
মোর ক্যানে নাই ?

একান্নভুক্ত পরিবারে সুযোগ সুবিধার বৈষম্যের কথা প্রবাদটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

কোনবা নদীত নাই ক্ষার।
কোন বা ঘরত নাই জাব্।

দোষে গুণে সংসার। কারো দোষ দেখতে নেই।

কাঙালের ছাওয়া হুদুম দেও
ধনীর ছাওয়ার পুকুটি সেও ॥

খেলেই হয় না। হজম করা চাই। আধপেটা খেয়ে গরীবের ছেলে মোটা সোটা হয়। ঘি, দুধ খেয়েও বড় লোকের ছেলে রোগা হয়।

কা-ঞ বা না জানে, ভাতারের নাঁও
নাজে না করে আঁও ॥

জেনে শুনে কিছুই গোপন করা উচিত নয়।

এবার কিছু ছড়ার নমুনা দেওয়া যাক—

হামার মাই নাচে হামার মাই নাচন হানে
আদোল ধান পাচে হামরা পাম কেচু
উয়ার মৌসিটা নিলাজী চালত কান্দে শুইয়া
ছালা ধরিয়া আসে হামার মাই নাচন জানে
চালত কান্দে ঝেচু হামরা পান শুয়া ॥

শিশু-কন্যার কচি হাতপা নাড়ানোকে কল্পনা করে ধান পাবার আশা ব্যক্ত করা হয়েছে। শুধু ধানই নয়, সুপারী ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রাপ্তির যোগও আছে।

কানা চাটি জল কেলাম্থ
দাদার ভিজিল গামছা
না কান্দিস না কান্দিস দাদা
গামছা মুখত দিয়া
আর বছর তোর বিয়াও দিম
জোড় কন্যা দিয়া
জোড় কন্যা পুটুর পুটুর
দৌড়ি আসিল কচুর ফুল
হেপা নদীর টেপা
চালকি নদীর পালকি
গিরিঘরের বউ গিলার এত ন্যাট ক্যাটানা ॥

বহু বিবাহ প্রথার ছবি ছড়াটি।

মামা ঘরের বগরি গছখান ঝুমঝুম করিছে হালের গরু ব্যাচেয়া
একনা দুকনা ছিড়িয়ে মামার মনত পড়িছে কইন্যা আনিল মাউরিয়া
না কান্দিস না কান্দিস মামা মুখত গামছা দিয়া ঢেকিয়া বাড়ি সোন্দাম্থ
আর বছর তোর বিয়াও দিম জোড় কইন্যা দিয়া সোনার ফুল হারাম্থ
জোর কইন্যা টসি বাপ কছে কি
পিড়া ফ্যালেয়া বসি মায় কছে কি ॥

এটি উত্তর বাংলার দরিদ্র আধিয়ারদের জীবনের ছবি। বিবাহযোগ্যা মেয়ে অথবা ছেলের বিয়ের জন্য অন্ন জোগানোর জন্য হালের গরু বিক্রি করতে বাধ্য হয় গ্রামের চাষী।

ইছলা নদীর পিছলা ঘাট
শাঁকা ভাঙ্গিম মুই তেরো পাট
কলসী ভাঙ্গিম মুই ঘাটতে
মরিয়া যাইম মুই চ্যাংরা বসতে।

বালবিধবার বেদনায় ভারাক্রান্ত ছড়াটি। ইছলা নদীর পিছলা ঘাটে হতভাগিনী তার এয়োতির সব চিহ্ন জন্মের মতন ঘুচিয়ে দিল। তার জীবনানন্দ স্বামীর অভাবে সে এ জীবন রাখতে চায় না।

গিরি ও প্রজাকে নিয়ে একটি ছড়া :—

গিরিরে গিরি মুতে ক্যাত
কিরে পরজা চিরিত চরাত
তোর গরুটা ধান খায় দুধে ক্যাত
আইজকার দিনটা খাবার পায় কাড়িয়া কাড়িয়া
কি খায় এক কাড়িয়া দুধ দিবেন
নলের গাজা না দেই
হাগে ক্যাত তোমার গরুটা বান্ধি
নাদা নাদা প্যা পু ॥

ভারতীয় দেববাদের অতি জাগতিক উৎস

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

সনাতন বৈদিক হিন্দুধর্মের মূলে আছে সগুণ দেববাদ। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মসাধনার প্রাচীনতম ও প্রমাণিত উৎস হচ্ছে বৈদিক সাহিত্য যাকে খৃষ্ট-পূর্ব ৫০০০ বৎসরের পূর্ববর্তী মনে করা হয়। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যকে একটু ঘনিষ্টভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বেদের থেকেও প্রাচীন এক মনুষ্য সভ্যতা প্রাচীন পৃথিবীতে বর্তমান ছিল। বেদের বিভিন্ন সূক্তে "প্রাচীন ঋষি, পুরাণ ঋষি, পুরাণ দেবতা" এই জাতীয় উল্লেখ থেকেই (১) এই সত্য প্রমাণিত হয়। বেদের উপাস্য অনেক দেবতাকে প্রাচীন যুগে উপাস্য 'হে ইন্দ্রদেব,' পূর্বতম ও আধুনিক ঋষি গণের দ্বারা স্তুত অগ্নি "প্রাচীন দেবতা বৃহস্পতি" এই ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে (২) যা থেকে বুঝা যায় যে বৈদিক দেবগণ বর্তমান বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের অনেক আগেই ভারতে পরিচিত ছিলেন। বৈদিক সাহিত্য ও প্রাক্ বৈদিক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ ইতিহাস চতুর্বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ ও অষ্টাদশ মহাপুরাণ একত্র করলে পাওয়া সম্ভব। বহু প্রচলিত হিন্দুমতে সৃষ্টির আদি ইতিহাস ও দেববাদ প্রথা অভিন্ন ও পরস্পরের পরিপোষাক। বেদ ও পুরাণ থেকে আমরা সৃষ্টি সম্বন্ধে এই তথ্য পাই (৩)।

প্রথমে কিছুই ছিল না, ছিলসীমাহীন বিপুল অন্ধকার। সেই সীমাহীন অন্ধকারে পরম শক্তিমান স্রষ্টার অন্তকরণে সৃষ্টির ইচ্ছা জাগল। তখন সেই সীমাহীন বিরাট অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্ট হল বিপুল জলরাশি। এই মহাসলিলে স্রষ্টার ইচ্ছার জন্ম নিল গোলাকার উজ্জ্বল স্বর্ণময় অণ্ড। সেই অণ্ডে জন্ম নিলেন নিপুণ পরম শক্তিমান ব্রহ্ম স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা বা মতান্তরে নারায়ণরূপে। ব্রহ্মা তাঁর স্বরূপ ও শক্তিকে দ্বিধাভূত করে অর্ধেক স্ত্রী ও অর্ধেক পুরুষ রূপে সৃষ্টি করলেন। এই স্ত্রী পুরুষ যুগলে মিলিত ভাবে সৃষ্টি করলেন এক বিরাট পুরুষকে। বিরাট আবার সৃষ্টি করলেন দশ অথবা ছয় প্রজাপতিকে। প্রথম প্রজাপতি কশ্যপ ও তাঁর ত্রয়োদশ পত্নীর গর্ভে জন্ম নিল আদিত্য, দৈত্য, স্থাবর ও জঙ্গম, দানব, নাগ, গন্ধর্ব, অপ্সরা ব্রাহ্মণ, মনুষ্য ও অমৃত। অদিতির পুত্রগণ আদিত্য বা দেবতা নামে পরিচিত ও দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা এঁদের সন্তানেরা দৈত্য বা দানব এই নামে পরিচিত। দেবতারা সুরা পান করতেন তাই সম্ভবতঃ তাঁরা 'সুর' এই নামে পরিচিত। "বলবন্" এই অর্থেও বেদে "অসুর" পদটির উল্লেখ পাওয়া যায় (৪) দেবতারা মোট সংখ্যায় ছিলেন তেত্রিশ ও অসুররা সম্ভবতঃ একশ (৫) কৃষ্ণ যজুর্বেদেও বলা হয়েছে যে একই পিতার বৈমাত্রেয় সন্তান হলেও দেবতা ও অসুরদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় (৬) অসুরগণ সংখ্যায় অধিক এবং বিদ্যা ও বুদ্ধিতে দেবগণের চেয়ে কোন অংশ নিকৃষ্ট ছিলেন না। দেবতারা পরাভূত হয়ে অসুরগণের বশ্যতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন (৭) এই যুদ্ধের কাহিনী বেদে নানা ভাবে বর্ণিত হয়েছে। ত্রিত দেবতা পরাভূত হয়ে কূপে নিক্ষিপ্ত হন। দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁকে উদ্ধার করেন। বারবার উৎপীড়িত হয়ে দেবতারা স্বর্গ পরিত্যাগ করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পৃথিবীর দিকে যাত্রা করেন। ঋগ্‌বেদ বলা হয়েছে যে স্বর্গ অত্যন্ত দূরবর্তী স্থান এবং সায়ানাচার্য তাঁর বেদভাষ্যে একাধিকবার বলেছেন যে দেবতারা সুদূর অন্তরীক্ষ হ'তে এসেছেন (৮)। অন্তরীক্ষ পথে দেবগণের মর্ত্যে আগমনের উল্লেখও বেদে

একাধিক সূত্রে পাওয়া যায় (৯)। অগ্নি এই দেবতাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেন এইজন্য অগ্নিকে দূত বলা হয় (১০)। প্রথমে দেবগণ এক ধূসর অসুর্বর ও অনাহীন ভূমিতে পদার্পণ করেন (১১)। তারপর তাঁরা একে একে প্রথমে সমুদ্রে, তারপর বিজন প্রান্তর, অরণ্য ও নদীপথ অতিক্রম করে ভারবর্ষের প্রত্যন্ত সীমায় অশ্মন্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হন। ভারতবর্ষের স্থানীয় জন সাধারণ দেবগণের মহিমময় আকৃতি, রৌদ্রদগ্ধ হলেও তপ্তকাঞ্চনের মতন বর্ণ ও অদ্ভুত বাহন দেখে চমৎকৃত হল (১২)। তাঁরা কোনদেশ হইতে আসছেন এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় জনসাধারণ জানতে পারেন যে দেবগণ প্রথমে সুদূর অন্তরীক্ষ হতে, তারপর মরুদেশ, সমুদ্র প্রভৃতি অতিক্রম করে আসছেন। বেদের কোন কোন সূক্তে উত্তরমেরু দেবগণের আবাস একথা বলা হয়েছে। বাল গঙ্গাধর তিলকের মতে উত্তরমেরুই ভারতীয় আর্যগণের মূল আবাস (১৩)। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনা সাধারণ ভাবে দেবতাদের হিমালয় প্রভৃতি সুউচ্চ স্থানের সঙ্গে যুক্ত করে (১৪)। তেত্রিশ জন দেবতার মধ্যে ৭ জন ছিলেন প্রধান। পৃথিবীতে কিছুদিন বসবাসের পর দেবতারা অপহৃত স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধারের মনস্থ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করেন। অসুরাধিপতি বৃত্রের সঙ্গে অন্তরীক্ষে দেবরাজ ইন্দ্রের একাধিকবার যুদ্ধ হয়। বৃত্র স্বয়ং মেঘের আড়ালে থাকিয়া ইন্দ্রের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করেন। মহাভারতে দেখা যায় যে অসুরদের মহাকাশে ভ্রাম্যমান তিনটি নগরী ছিল। এই তিনটি নগরী আকৃতিতে বর্তমান মহাকাশ উপগ্রহের মতন কিন্তু আয়তনে অনেক বড় (১৫)। এই ভ্রাম্যমান মহাকাশ নগরীর মধ্যে সৈন্য সামন্ত, রসদ ও জীবনযাত্রার উপযোগী সমস্ত ভোগ্যবস্তু সংগৃহীত থাকত। দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনের সাহায্যে এই ভ্রাম্যমান গগনচর দৈত্যপুর ধ্বংস করেন। দেবাসুর যুদ্ধের সময় অগ্নি পুনরায় দেবগণের পথপ্রদর্শক হন এবং বিষ্ণু তিনবার স্বর্গ ও মর্ত্যে গমনাগমন কানন। "ত্রেধা নিদধে পদম্" এই পদটি এইরূপ অর্থেরই যেন সূচনা করে। দেবাসুর যুদ্ধের বর্ণনা থেকে আরও দেখা যায় যে অসুরদের একটি বৃহৎ অংশ পৃথিবীতে থেকে সমুদ্রগর্ভে ও পর্বতগুহায় আত্মগোপন করে। অবসর মত তারা বেরিয়ে এসে কুটযুদ্ধে দেবতা ও মানুষকে বিব্রত করে তুলত (১৬)। শেষ পর্যন্ত অসুররা সদলে পরাভূত ও বিধ্বস্ত হয়। মুষ্টিমেয় জীবিত অসুর পাতালে আশ্রয় নেয় (১৭)। অসুরকুলের পরাজয়ের পর বিষ্ণু পৃথিবীর শাসন মনুষ্য সমাজের উপরে অর্পণ করেন ও দেবগণ স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রথমে এগারজন দেবতা স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করেন, তারপর আরও এগারজন অন্তরীক্ষাভিমুখে যাত্রা করেন এবং অবশিষ্ট এগারজন মনুষ্য সমাজের সঙ্গে বসবাসের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতেই থাকিয়া যান, পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে দেবগণের ভাববিনিময় হত সংস্কৃতভাষার মাধ্যমে। এজন্য "সংস্কৃত ভাষাকে" দৈবী বাক না দেবভাষা বলা হয়েছে। পৃথিবীতে যে এগারজন বসবাস আরম্ভ করেন তাঁদের একজনকেই অথর্ববেদে "ইন্দ্র" নামে অভিহিত করা হয়েছে (১৮)। দেবকুলের চিকিৎসকরূপে পরিচিত দুই অশ্বিনী কুমার সর্বদা বিমানে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যাতায়াত করতেন। এই বিমান ত্রিকোণ, ত্রিশীর্ষ, ত্রিস্তর, তরল জ্বালানীর দ্বারা পরিচালিত এবং তিনটি স্তম্ভ যুক্ত এইরূপ বর্ণনা বেদে পাওয়া যায়। বেদের অন্ততঃ ১০টি সূক্তে তিনজন সারথিযুক্ত ও মনোজ এই বিমানের প্রশংসা করা হয়েছে (১৯)।

ভারতীয় দেববাদের এই আলোচনা থেকে বেশ বোঝা যায় যে দেবতারা সাধারণ মানুষের চেয়ে

অনেক উন্নতস্তরের জীব ছিলেন দেবতারা আর্য নন। তাঁদের আবির্ভাব আর্য অনার্য সংঘাতের অনেক পূর্বে। ঋগ্বেদের একাধিক সূক্তের উল্লেখ ও সায়নাচার্যের অভিমত থেকে এই ধারণাই প্রবল হয়ে উঠে যে দেবতারা সুদূর অন্তরীক্ষের কোন স্থান থেকে এই পৃথিবীতে আসেন। অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোন উন্নত লোকের তাঁরা অধিবাসী। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৫৬ তম সূক্তে বলা আছে যে পিতৃপুরুষগণ যে সমস্ত প্রাচীন ব্রহ্মাণ্ডে আজও কেউ যায়নি সেই সমস্ত ভুবনে যাতায়াত করেন (২) সুতরাং অন্য ব্রহ্মাণ্ড থেকে উচ্চশ্রেণীর চেতন জীবগণের পক্ষে দেবতারূপে পৃথিবীতে পদার্পণ করা একেবারে অসম্ভব নয়। এই জাতীয় সিদ্ধান্তের সমর্থনে আমরা নিম্নলিখিত যুক্তি পরম্পরা উপস্থিত করতে পারি :—

(১) বেদপুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে দেবগণের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা ও দেবাসুর যুদ্ধের বিশদ উল্লেখ।

(২) দেবতাদের অন্তর্ধান ও মন্ত্রের মাধ্যমে সংযোগ রক্ষার উপায়।

(৩) দেবগণের অন্তরীক্ষ থেকে আগমনের বিষয় সুস্পষ্ট উল্লেখ।

(৪) ভারতীয় ধর্মচেতনায় দেবতা ও আকাশের উল্লেখ ও আকাশের একত্র উল্লেখও দেবগণের মনুষ্যোচিত অবয়ব সংস্থান ও আচার ব্যবহার।

ঋগ্বেদের ও যজুর্বেদের কয়েকটি মন্ত্রে মরুৎ, দুই অশ্বিনীকুমার এবং ইন্দ্রের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে তাঁদের আকৃতি মানুষের মতন (২১)। মহাভারতে বনপর্বে দেবগণের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে মন্ত্রের উদ্দেশ্য দেবগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা। এই সংযোগ স্থূল মাধ্যমে নয়, অতীন্দ্রিয় মাধ্যমে (২২)।

এখন প্রশ্ন উঠে যে দেববাদের এই দিকটি এতদিন কেন আলোচিত হয়নি? এ বিষয়ে ভারতীয় বেদ ব্যাখ্যাতৃ সম্প্রদায় কেন নীরব? উত্তরে বলা যায় যে ঐতিহাসিক কালবিচারে বৈদিক সাহিত্য যে কত বড় সুপ্রাচীন তা সঠিকভাবে নিরূপিত হয়নি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের মধ্যে জ্যাকবি সাহেবই একমাত্র এই সভ্যতাকে জ্যোতিষশাস্ত্রলভ্য তথ্যের ভিত্তিতে খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে স্থাপিত করেছেন। অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এই সভ্যতাকে আরও অর্বাচীন বলেই মনে করেন। ভারতীয় পণ্ডিতবর্গ বৈদেশিক সভ্যতাকে খৃষ্টপূর্ব অন্যূন ৫০০০ অব্দে স্থাপন করেন। বেদের অন্তর্গত বিভিন্ন সূক্তের এবং বৈদিক দেববাদের প্রথম নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাতা যাস্ক। যাস্ক আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব সপ্তম শতকে আবির্ভূত হন। যাস্কের নিরুক্ত তাঁর পূর্বাচার্যগণের সংগৃহীত নিঘণ্ট, বা বৈদিক শব্দ সংগ্রহের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। যাস্ক যজুর্বেদ ছাড়াও গোপথ ব্রাহ্মণ সহ কয়েকটি ব্রাহ্মণ, প্রাতিশাখ্য প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। যাস্ক তাঁর গ্রন্থে বহু পূর্বাচার্যের উল্লেখ করেছেন। এজন্য বেদ-ব্যাখ্যাতাকূপে যাস্ককে অর্বাচীন বলাই সঙ্গত। কিন্তু তাঁর পূর্বাচার্যগণের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। বেদের মধ্যেই অনেক দেবতার অস্তিত্ব বিষয়ে নেতিবাচক ইঙ্গিত আছে (২৩)। স্বয়ং যাস্ক তাঁর নিঘণ্টু বিবৃতিতে (২৪) এই শ্রেণীর বিভিন্ন মতের উল্লেখ করছেন যাঁর মধ্যে মোটামুটি নিম্নোক্ত দুইটি মত প্রধান। একশ্রেণীর পণ্ডিত ও ব্যাখ্যাতা মনে করেন যে দেবতারা সাধারণ দেহধারী জীবের মতই শরীরী। কারণ মানুষের মতন তাঁদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, তাঁরাও মনুষ্যোচিত আহার বিহার প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হন। বেদের মন্ত্রে (২৫) ইন্দ্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্তুতি করা হয়েছে। দেবতাদের শরীর না থাকলে

বেদের অধিকাংশ মন্ত্রই নিরর্থক হয়ে পড়ে। বেদের বহুমন্ত্রে দেবতাদের মধ্যে কথোপকথনের প্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে। যেমন যমযমী সংবাদ, সরমাপনী সংবাদ, উর্বশী পুরুরবার কথোপকথন প্রভৃতি। দেবতাদের স্থূল আকৃতি ও চেতনা না থাকলে পরস্পরের এই যোগাযোগ সম্ভব হত না। দেবতাদের অন্ন, পাণীয় গ্রহণ, রথ, অশ্ব, বিমান প্রভৃতি ব্যবহার অথবা অস্ত্রশস্ত্র ধারণ—এগুলি তাদের বহু পরিচিত অবয়ব সংস্থানেরই পরিচায়ক।

এই মতের বিরোধিতা করে দেবগণের অপৌরুষেয়ত্ববাদিরা বলেন যে দেবগণ শরীরী নন। তাঁদের আকৃতিচিন্তা সাধকদের কল্পনা মাত্র। কারণ, দেবগণের মধ্যে অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র এঁরা প্রত্যক্ষ দৃশ্য। অথচ এঁদের কারুরই মনুষ্যাকৃতি নেই। এজন্য দেবতারা শরীরী এই কথা বলা যায় না। মানুষের মতন বেদে বহু অচেতন পদার্থেরও স্তুতি দেখা যায়। বৈদিক ঋষিরা ওষধি, প্রস্তর মুষল, এদেরও চেতন পদার্থের মতনই প্রশংসা ও বন্দনা করছেন (২৬)।

এছাড়া বহু অচেতন পদার্থেও মানবীয় সত্তা বা লৌকিক কর্ম আরোপণ করে প্রশংসা (২৭) করা হয়েছে। মানুষের মতন দেবতারাও রথ প্রভৃতি যানবাহন, বস্ত্র, শয্যা এ সমস্ত উপভোগ করেন একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় না কারণ নদীর স্তুতি প্রসঙ্গে অচেতন নদীতেও রথযোজনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুতঃ এটি একটি রূপক। দেবতাদের রথারোহণ, অশ্বারোহণ প্রভৃতিও সেইরূপ রূপক। আচার্য যাস্ক এই দুই মতের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলেছেন যে দেবতারা সাকার ও নিরাকার এই উভয় বিধ। দেবতারা মূলতঃ চেতন শক্তি কিন্তু জাগতিক কর্ম সম্পাদনের জন্যই তাঁরা জড় মূর্তি পরিগ্রহ করেন। কিন্তু একাধিক মতের উল্লেখ ও মতবিরোধ যাস্কের পূর্বে ও পরেও দেখা গেছে। জৈমিনি তাঁর পূর্ব-মীমাংসাসূত্রে দেবগণের শরীরী রূপ ধারণের তথা স্বীকার করেননি। অন্যদিকে মহর্ষি বেদব্যাস জৈমিনির এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেননি। তাঁর মতে দেবগণের শরীর ধারণ সর্বতোভাবেই সম্ভব ও যুক্তিসিদ্ধ। শ্রীশঙ্করাচার্যও তাঁর ভাষ্যে বেদব্যাসকে সমর্থন করে দেবতারা যে দেহী মানুষের মতই শরীরীরূপ ধারণ করতেন একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। যাস্কের নিরুক্ত থেকে প্রাচীনকালে বৈদিক দেববাদ ও বেদতত্ত্বের ব্যাখ্যাতারূপে আমরা মোটামুটি চারটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব খুঁজে পাই। এরা হলেন (১) যাস্কের নৈরুক্ত মত (২) বেদের যাজ্ঞিক মতবাদ (৩) আত্মবিৎ সম্প্রদায় (৪) ঐতিহাসিক।

নিরুক্তকার সাকার ও নিরাকার দেববাদের সমন্বয় সাধন করেও মাত্র তিনটি দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন অগ্নি, ইন্দ্র অথবা বায়ু এবং সূর্য। যাস্কর মতে সমস্ত পার্থিব দেবতাই অগ্নির প্রকারভেদ অন্তঃ রীক্ষোক্ত দেবগণ ইন্দ্রের প্রকার ভেদ ও দ্যুলোকস্থ দেবগণ সূর্যের প্রকারভেদ। সূর্যেই তাঁদের উৎপত্তি ও সূর্যেই তাঁদের বিলয় (২৮)। শৌনকের "বৃহদ্দেবতায়" ও অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্যকেই প্রধান দেবতা বলে স্বীকার করা হয়েছে। তাঁর মতে কর্মভেদ অনুসারে ইন্দ্রের অথবা বায়ুর ২৬টি, অগ্নির ৫টি ও সূর্যের ৭টি নাম।

বেদযাজ্ঞিক সম্প্রদায় মনে করেন দেবতারা কর্মে ও স্বভাবে পরস্পর পৃথক ও তাঁদের সংখ্যা অনন্ত। আত্মবিৎ সম্প্রদায় মনে করেন এক সর্বব্যাপী ও মহাশক্তিমান মহান আত্মা তাঁর অপরিমেয় শক্তিতে বহুরূপ ধারণ করেন। দেবতাদের বাহ্যরূপ শারীরিক কর্ম প্রভৃতি সমস্তই সেই মহান্ আত্মার বিবর্তন-মাত্র। এই চারটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐতিহাসিক মতবাদের প্রবক্তাগণ দেবতা ও অসুরদের ঐতিহাসিক

ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস করেন। বেদের অশ্বিদেবতা দুই জনের সম্বন্ধে যাস্ক ঐতিহাসিকেদের মত উদ্ধৃত করে বলছেন যে এরা প্রাচীন পুণ্যকর্ম রাজা। যাস্কের ভাষায় "রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ" অর্থাৎ এঁরা পুণ্যাকর্মের ফলে দেবত্বে উন্নতী হয়েছেন। এইভাবে বৃত্রকে নিরুক্তকার 'মেঘ" এই অর্থে উল্লেখ করেও ঐতিহাসিক মতানুসারে অসুর ত্বষ্টার পুত্র বলেও উল্লেখ করছেন। বেদ যে ইতিহাসমিশ্র একথা দ্বিধাহীন ভাষায় ব্যক্ত করে নিরুক্তকার বলেছেন "তত্র ব্রহ্মেতিহাসমিশ্রিম্। যাম্মিশ্রং গাথামিশ্রং ভবতি" (২৯) অনুরূপভাবে ঐতিহাসিকমতে অদিতি দেবমাতা একথাও যাস্ক তাঁর নিঘণ্টু বিবৃতির চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থপাদের প্রথমেই বলেছেন।

আচার্য যাস্কের এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী মত সংগ্রহ থেকে দেখা যায় যে নিরুক্ত রচনার সময়ে দেবগণের উৎপত্তি ও স্বরূপ বিষয়ে কোন আচার্যেরই বিশেষ কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা ছিল না। তাঁরাও পূর্বপূর্ববর্তী আচার্যের মত কিম্বদন্তী বা ইতিহাসলব্ধ তথ্যকেই যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। বেদের রচনাকাল পাশ্চাত্য অভিমতানুসারে ২৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ধরে নিলেও নিরুক্তকার ও বেদের রচনাকালের মধ্যে প্রায় ২০০০ বৎসরের ব্যবধান থাকে। এব ব্যবধান আরও ব্যাপক হওয়াই সঙ্গত। এই দীর্ঘ সময়ে দেবগণের উদ্ভব, তাঁদের সঠিক সংখ্যা ও স্বরূপ এই সব বিষয়ে প্রচলিত তথ্যের পরিবর্তন ও বিকৃতি সম্ভব। তা ছাড়া বেদের মধ্যে প্রাচীন আচার্য, পূর্বাচার্য, বহু প্রাচীন ঋষি ও পুরাতন দেবতা (৩০) এই এই শ্রেণীর উল্লেখ থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে বেদের বহু পূর্বে অথবা বহির্ভারতে কোথাও উন্নত ও গতিশীল মনুষ্যসভ্যতা বিদ্যমান ছিল এবং দেবগণ শরীরীরূপ ধারণ করেই কোন সুপ্রাচীন অতীতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বেদের দুই একটি ঋক্ ছাড়া, সর্বানুক্রমণী, প্রাতিশাখ্য অথবা নিরুক্তে দেবগণের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপরে কোন আলোকপাত করা হয়নি। মহাভারতের নল-দময়ন্তী-সংবাদে দেবতাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে 'দেবতাদের চক্ষে পলক পড়ে না, গাত্রে ঘর্মের উদ্‌গাম হয় না, গলার মালা অমলিন থাকে, ও পা মাটি স্পর্শ করে না।' এই তথ্য বহু পূর্ববর্তী আচার্য পরম্পরায় মহাভারতে সংগৃহীত হয়েছে। বেদের কোন কোন সূক্তে ইন্দ্র ও অগ্নি দুইজন চিরযৌবনসম্পন্ন একথা বলা হয়েছে। রামায়ণেও বলা হয়েছে যে দেবতারা সব সময়ে পঁচিশ বৎসরের যুবকের মতন। পাণিনির ধাতুপাঠে "স্তন" ও "নাদ" এই দুইটি ধাতুকে দেবশব্দবাচক বলা হয়েছে (৩১) "দেবশব্দ" এই পদটি কোন অতিজাগতিক বৈশিষ্ট্যের সূচক, কারণ মেঘধ্বনির বাচক অনেক শব্দই আমরা ধাতুপাঠে পাই। অমরকোষে শ্রীঅমরসিংহ "গুহা" এই পদটিকে ব্যাখ্যা করেছেন "দেবতাদের দ্বারা কাটা গর্ত" এই বিশেষ অর্থে (৩২)। "দরী" এই পদটিকেও "দেবখাত গুহা" বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অমরকোষে আরও বলা হয়েছে যে দেবতাদের বাক্য শব্দের মত তীক্ষ্ণ, সুরা তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় পানীয়, তাঁদের দেহ অত্যন্ত উজ্জ্বল ও জরাবিহীন, ভাষা সংস্কৃত এবং দেবগণের দ্বারা ব্যবহৃত অন্তরীক্ষগামী যান "বিমান" এই নামে খ্যাত। ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্রে প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করে বলা হয়েছে দেবগণ (৩৩) ভারতভূমিকে বিশেষ ভাবে পছন্দ করেন। দেবতারা নির্নিমেষ ও জরাহীন দেবতাদের মধ্যে শোকের কোন প্রকাশ নেই এজন্য ভরত মুনির নির্দেশ ছিল যে করুণরসপ্রধান উৎসৃষ্টিকাঙ্ক নামক উপরূপকে দেবচরিত কোনভাবেই সন্নিবিষ্ট হবে না। তাঁর মতে নাটক ও প্রকরণ

দেবচরিত্র বর্জিত হবে কিন্তু ডিম ও সমবকারে দেবচরিত্র প্রয়োগ করা সম্ভব কারণ ডিম বীররসপ্রধান, সমবকারও বীররস প্রধান। দেবচরিত্র শৌর্যবীর্য সমন্বিত ও দেবতারা দীর্ঘদেহী, দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধ এই ধরণের উপরূপকেই দেখান সম্ভব। ভরতমুনি রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে ১০৮ হস্ত প্রশস্ত, বিকৃষ্ট ও জ্যেষ্ঠশ্রেণীর রঙ্গমঞ্চই দেবাসুর সংগ্রাম সংক্রান্ত উপরূপকের (৩৪) অভিনয়োপযোগী। আচার্য মনু ব্রহ্মচারীর পক্ষে স্নানযোগ্য জলাধারের উল্লেখ (৩৫) করে বলেছেন "নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু তটঃসু চ। স্নানং সমাপয়েন্নিত্যং গর্তপ্রস্রবণেষু চ।" এখানে নদীর সঙ্গে অন্বিত 'দেবখাত' পদটি বিশেষ্য ও বিশেষণ যে কোন ভাবেই হোক না কেন, দেবসম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যেরই পরিচায়ক।

বৈদিক সাহিত্যে দেবগণের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে প্রাচীন কিম্বদন্তী ঐতিহ্য, লোকসাহিত্য রামায়ণ, মহাভারত, নাট্যশাস্ত্র, মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে বিধৃত দেবস্বরূপের এই বৈশিষ্ট্যগুলি তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেবতারা যে সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন এবং উচ্চ শ্রেণীর দেহধারী জীব এই সত্যই পরিস্ফুট হয়ে উঠে। তাঁদের কোনক্রমেই বিদেহী চেতনসত্তামাত্র এই বলে পরিচয় দেওয়া যায় না। গভীরভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করলে নিরুক্তকার যাস্ক দেবতাদের অশরীরী সত্তার সমর্থনে যে বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ করেছেন তা বিশেষ গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। দেবতারা শরীরী জীব এই সত্যই প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠে। দেবতাদের শরীরী রূপ দেখেই তাঁদের মূর্তি নির্মাণ আরম্ভ হয় এই তথ্য সর্ববাদিসম্মত। কৌষিতকী ব্রাহ্মণ ও শতপথ ব্রাহ্মণে দেবমূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। লামা তারানাথ প্রাচীন কিম্বদন্তীর ভিত্তিতে উল্লেখ করেছেন যে দেবকুলের মধ্যেও একদল সুদক্ষ স্থপতি ছিল এবং তাঁরা দেবমূর্তি ও অন্যান্য ভাস্কর্য রচনায় দক্ষতার পরিচয় দেন। যজুর্বেদের "দেবলোকায় পেশিতারম" (৩৬) এই অর্থকেই পরিস্ফুট করে। দেবগণের অতি জাগতিক উৎস বিষয়ে সায়নাচার্যের অভিমত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সায়নাচার্য ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অন্তর্গত একটি ঋকের ব্যাখ্যানে মরুৎগণ (৩৭) কোথা হতে এসেছেন এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন "কস্মাদিতি উচ্যতে পরমস্যাঃ পরাবতঃ অত্যন্ত দূরদেশান্তরীক্ষাৎ।" দশমণ্ডলে অগ্নির সম্বন্ধেও বলা হয়েছে যে অগ্নি দ্যুলোকের উর্ধে অত্যন্ত দূরবর্তী অন্তরীক্ষ দেশ হতে এসেছেন (৩৮)। দশম মণ্ডলে বৃহস্পতির উদ্দেশ্যেও বলা হয়েছে যে বৃহস্পতি মেঘলোকবাসী ও আকাশপথে স্বর্গে গমন করেন (৩৯)। দেবগণের জন্মমৃত্যুর রহস্য দুর্জ্ঞেয় একথাও ঋগ্বেদে বলা হয়েছে।

ভারতীয় হিন্দুদের দেববাদ সম্পর্কে আলোচনা বহু বিস্তৃত ও দুরূহ। এই তত্ত্বের উদয় বৈদিক সাহিত্য ও দেববর্ণিত সমাজের বহুপূর্বে। সেই সুদূর যুগের অন্ধকারের আবরণ উন্মোচন করে সত্য-প্রতিষ্ঠা করা প্রায় দুঃসাধ্য। বর্তমান যুগের মহাকাশবিজ্ঞান অন্য ব্রহ্মাণ্ডে জীবনের সম্ভাবনাকে একরকম বাস্তব বলে মেনে নিয়েছেন। ভারতীয় দেববাদ অবৈজ্ঞানিক ভাবালুতা নয়। দেবতারাও জন্মমৃত্যুর অধীন। মহাভারতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে মন্ত্র হচ্ছে দেবগণের সঙ্গে যোগাযোগের উপায়। দান প্রতিদানই দেবমানুষের সম্পর্কের মূল। যুক্তিবাদী মন নিয়ে বিচার করলে দেবতারা

অন্য ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চশ্রেণীর জীব এবং স্মরণাতীত কাল আগে তাঁরা পৃথিবীতে পদার্পণ (৪০) করে বিভিন্ন পর্যায়ে জীবগণকে সৃষ্টি করেছেন এই রকম সম্ভাবনাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

---

১ ঋগ্বেদ ১'৩৯'৭ ; ১.৫৩'২ ; ১'৯৬'৭ ; ১'১০৩'১ ; ১'১৭৯'১ ; ১'১৬৭-১১ ; ১'১২৯'৫
৫'৩১'৬ ; ৫'৪২'৬ ; ৫'৪৪'১ ; ৫'৭৭'.১ ২ ঋগবেদ। ৪'৪০'২ ; ৮'২১'৯ ; ৮'২৪'১৫-১৬ ; ৮'৪০'
৯ ; ৮'৬১'৪ প্রভৃতি ৩। ঋগ্বেদ ১০'৯০'১-১৫ ; ১০'.২৯'১-৫ ; মহাভারত, আদিপর্ব ৫৬ অঃ।
মনুসংহিতা ১'১-২০ অথর্ববেদ ৮'২'৮ ; শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১'১৩ ; নারদীয় সুক্ত ঋগ্বেদ ১৩'১২৯'১-৬
৪ ঋগ্বেদ ১'৩৬'২ (অসুরমিত্রাবরুণ) ; অসুর ইন্দ্র ৯'৯৯'১ (অসুর সোম) ৫। ,, ৮'৩৫'৩ ; ৮'৩৯'৯ ;
৮'৫৭'২ ; ১'৪৫'২ ; ৩'৬'৬'৯ ; ৩'৪৬'১১ ৬। দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্তে ন ব্যজয়ন্ত—কৃষ্ণযজুর্বেদ,
পঞ্চম কাণ্ড, পঞ্চম অষ্টক। ৭। কণীয়াংসো দেবাঃ আসন্ ভূয়াংসোহসুরাঃ। তান্ দেবান্ অসুরা
অজয়ন্, তে দেবা পরাজিগ্যানা অসুরানাং বৈশম্পায়ন্। ৮। ঋগ্বেদ ৫'৬১'১-৪ ; ৭'২৪'৩ ; ৫'২'১১ ;
৬'৪০'৫' ৯। ঐ ১'১৬৫'১-৬ ; ৮'৫'৩১ ; ৮'১০'১-১১ ১০। ঋগ্বেদ ১'১২৮'২ ; ৫'২৫'২
১১। ঐ ৫'৩১'১-৪ ১২। ঐ ৫'৬১'১-৪ ১৩) The Antic Home of the Aryans
Ch 2 ১৪। কুমারসম্ভব ১১ ; নাট্যশাস্ত্র ২৫.৪-৭ ১৫। মহাভারত, বনপর্ব ১৭৩ তম অঃ
১৬। মহাভারত, বনপর্ব ১৬০-১৬৬ অধ্যায় ১৭। মার্কণ্ডেয় পুরাণ দেবী সপ্তশতী ৮.২৭ ১৮।
ইন্দ্রো জাতো মনুষ্যেষু, ৪.১২.৩ ১৯। ঋগ্বেদ ১'১০'৩ ; ১'২৫'৭ ; ১'৩৪'৮৯ ; ১'৪৭'৮২ ; ১'৫২'
১/২ ; ১'৮১'২-৪ ; ৪৬ ২০। ঐ— ১৯'৫৬'৪'৫। ২০। ঋগ্বেদ ৯'১৮'২-৮ ; ১'৮১'৪ ;
১.১৮২.৮ (নরাকারৌ অশ্বি নৌ) ২২। অকামোবা সকামোবা সমিষ্যতি তে বশে। বিরধো মন্ত্র
সংশান্তো ভবেদ ভূতা ইশনতঃ (বনপর্ব ; ৩০৫ অং) ২৩। ঋগ্বেদ ৫'২'৩ ; ১ ; ৫'৩০১ ; ৫'৩২'৬ ;
৬'২৭'১ ; ৬'৩৪'১ ; ৮'২৪'৩০'৮'১০০'৩ ২৪। নিরুক্তদৈবতকাণ্ড তৃতীয়ঃ। সপ্তমোহধ্যায়ঃ, পঞ্চম
পাদঃ দ্বিতয়ো খণ্ডঃ ২৫। ঋগ্বেদ ৬'৪৭'৮ ; ৩'৩০'৫ ২৬। ঋগ্বেদ ৮'৪'২৯ ; ৮'৩'৭ নিরুক্তে
সপ্তমোহধ্যায়ঃ তৃতীয়পাদঃ ; অষ্টমঃখণ্ড ২৭। ঋগ্বেদ ৮'৪'২৯ ২৮। তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ
অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বেন্দ্রো বা অন্তরীক্ষস্থানঃ সার্য্যা দ্যুস্থানঃ।" —নিরুক্তে, সপ্তমোহধ্যায়ঃ দ্বিতীয়ো
পাদঃ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী প্রণীত বেদার্থ বিচার দ্রষ্টব্য। ২৯। নিরুক্তে
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ সপ্তদশঃখণ্ডঃ পঞ্চমপাদঃ। ৩০। ঋগ্বেদ ১'১৭৯'১ ; ১'১৩৭'১১ ; ১'১.৯৫ ; ১'৫৩
'২ , ১'১০৩'১ ; ১'১৩৯'৮ ; ৪'৪৮'১ ; ৫'৫৩'১ , ৮'২১'৯ ; ৮'২৪'১৫-১৬ ; ৮'৪০'৯, ৮'৫২'৯
৮'২৩'৪ ৩১। ধাতুপাঠ চুরাদি ১৮৫৯ ও ১৮৬০ ৩২। "দেবখাতবিলে গুহা"—অমরকোষে শৈলবর্গ
১৪। 'দরী স্যাৎ কন্দরো খাতবিখে তু গহ্বরং গুহা।" ভূমিকাণ্ডে, তৃতীয় পর্যায়—অভিধানা-
চিন্তামণি। ৩৩। নাট্যশাস্ত্র ১ম অধ্যায়, ৩৭-৪৭ কারিকা ২য় খণ্ড। ৩৫। নাট্যশাস্ত্র দ্বিতীয়
অধ্যায়, অষ্টাদশ খণ্ড শ্লোক ৯৩-১০০ ৩৫। মনুসংহিতা ২'১০৮ ৩৬। শুক্ল যজুর্বেদ ৩৩'১৮১০
৩৭। ঋগ্বেদ ৫'৩১'১ ৩৮। ঋগ্বেদ ১০'১৮৭'২-৪ ২-৫ ৩৯। ঋগ্বেদ ১০'৩৮'১২ ; ৪'৫০'২ ; ২০'
৬৭'৪০ ৪০। ঋগ্বেদ ১'৪৫'২ ; ১'১৩৯'১১ সামবেদে বলা হয়েছে—"ইত এতে উদারুহন্ চিরপৃষ্ঠানি
আরুহন্। প্রতুর্জয়ো যথা পথা দ্যামঙ্গিরথো যজুঃ।"

সমালোচনা

আকাশের কথা ॥ শ্রীশংকর চক্রবর্তী। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-৯ দাম-চার টাকা।

চিরকাল ধরেই মহাকাশ মানুষের কাছে এক পরম বিস্ময়। "মানুষ তার বুদ্ধিগ্রাহ্য চেতনার উন্মেষের প্রথম মুহূর্ত থেকেই আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রকে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেছিল। সেই অর্থে জ্যোতির্বিদ্যা বোধ হয় পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন বিদ্যা।" মহাকাশের কল্পনাতীত ব্যাপ্তি, অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র, সূর্য-চন্দ্রের ক্রিয়াকলাপ, ধূমকেতু ইত্যাদি নানা বিষয় মানুষকে যত বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছে, তত বেড়েছে তার রহস্য-উন্মোচনের স্পৃহা। ধূসর অতীত থেকে, মানুষ এসবের রহস্য অনুসন্ধান করে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করে চলেছে। গাণিতিক সূত্রের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে অলৌকিক কাহিনী। যেখানে কোন হদিস মেলেনি, কোন যুক্তি খাটেনি, সেখানেঅন্ধ-কুসংস্কার, অলীক কল্পনা বা ঐশী শক্তির ওপর মানুষ নির্ভর করছে। একটি ভুল তত্ত্ব জনমানসে বহুকাল ধরে এমন দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়েছে যে এর সম্পূর্ণ বিপরীত তত্ত্ব (যদিও সেটি সত্য) প্রকাশ করতে কেউ ভয় পেয়েছে এবং কেউ কেউ প্রকাশ করার জন্য নিহত হয়েছে বা চরম নিগৃহীত হয়েছে। তবু মানুষের মনে জ্ঞান স্পৃহা থেমে থাকেনি। সত্য উদ্ঘাটন থেকে বিরত হয়নি মানুষ। কালক্রমে নানা সূত্র, তত্ত্ব ও তথ্য নির্ণয় ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে মানুষ—মহাবিশ্বের এক ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র প্রাণী, নব নব পথের সন্ধান পেয়ে বিশ্বরহস্য ভেদের খেলায় মেতে উঠেছে। বর্তমানকালে, জ্যোতির্বিদ্যা ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভূত উন্নতিসাধনের ফলে মহাকাশ গবেষণার যেমন সুবিধা হয়েছে, তেনি এর রহস্য জটিল হতে জটিলতর হতে সুরু করেছে।

সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের সঙ্গে, বাঙ্গলা ভাষায় লিখে, মনে হয় প্রথমে বিশ্বপরিচয় করিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ। অন্ততপক্ষে, এ বিষয়ে তাঁর বইটিই সর্বপ্রথম প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরে কোনো কোনো শিক্ষাসংস্থা বা উৎসাহী লেখক এ কার্যে ব্রতী হয়েছেন বটে, কিন্তু তেমন সাড়া মেলেনি। আজকাল ইংরাজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায়, জটিল গাণিতিক তত্ত্ব ও জ্যোতির্বিদ্যার নীরস দিকটা এড়িয়ে বিভিন্ন বই প্রকাশিত হয়েছে এবং অনেকগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাঙলা ভাষায় লেখা, শ্রীশংকর চক্রবর্তীর "আকাশের কথা" এমনি একটি সাড়াজাগানো বই। ক্ষুদ্র হলেও মহামূল্যবান গ্রন্থ।

আলোচ্য পুস্তকটির সাতটি অধ্যায়ে, জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাস থেকে সুরু করে অতি দুরূহ তত্ত্ব ও তথ্য এবং বর্তমান কালের আবিষ্কার ও গবেষণার কথা সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় বলা হয়েছে। স্বল্পকথার মধ্যে, গ্রন্থকার পাঠককে নক্ষত্রের অন্তঃপুরে নিয়ে গেছেন। সাবলীল ভঙ্গীতে বর্ণালী ব্যাখ্যা করে, বুঝিয়ে দিয়েছেন কি করে বর্ণচ্যুতির দ্বারা তারাজগতের অপরিসীম গতিবেগ মাপা যায়। নক্ষত্রের বিবর্তন, সুপারনোভা, লোহিত দানব (রেড জায়েন্ট) শ্বেতবামন (হোয়াইট ডোয়ার্ফ), কৃষ্ণগহ্বর (ব্ল্যাকহোল) কোয়াসার, নিউট্রন নক্ষত্র প্রভৃতি অত্যাধুনিক জটিল বিষয়গুলির সঙ্গে সাধারণ

পাঠককে অতি সহজে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এমন কি চন্দ্রশেখর লিমিট, হয়েল-নারলিকার তত্ত্ব, মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ ও মহাবিশ্বের প্রাণের সন্ধান সম্বন্ধেও পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

শ্রীশংকর চক্রবর্তী প্রকৃত বিজ্ঞানসেবী এবং বিজ্ঞান বিষয়ে (বিশেষভাবে আকাশ বিষয়ে) সুবক্তা বাঙালার কিশোর-কিশোরীদের বিজ্ঞানে উৎসাহী করার ব্যাপারে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত। 'আকাশের কথা' লিখে, শ্রীচক্রবর্তী বাঙ্গালী পাঠকের সবিশেষ উপকার করলেন। আজকের দিনে অনেকেই আকাশের কথা শুনতে ও জানতে চায়, কিন্তু জ্যোতিবিদ্যার কণ্টকিত পথে হাঁটতে ভয় পায়। আলোচ্য পুস্তকটি সে ভয় দূর করবে। এটি আকাডেমিক আলোচনার গুরুভারে পীড়িত নয়। বরং সাধারণ পাঠকের জ্যোতিবিদ্যা সম্বন্ধে আগ্রহ এবং কৌতূহলকে জাগিয়ে তোলে। ভূমিকায় গ্রন্থকার জানিয়েছেন যে "সৌরজগৎ" নামে আর একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। শ্রীচক্রবর্তীকে অনুরোধ করি তিনি আরও কিছু এ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করুন। জিজ্ঞাসা, পুস্তকটি প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

চিত্র মুদ্রণে এতটা দীনতা প্রকাশ সমীচীন হয়নি। কয়েকটি বেশী ও ভাল ছবি, দূরবীণ বিষয়ে আরও কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য এবং কিছু নক্ষত্রমণ্ডলীর বর্ণনা সংযোজিত করলে, মনে হয় গ্রন্থটি আরও চিত্তগ্রাহী হত। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে মুদ্রণঘটিত প্রমাদগুলি সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

অশোককুমার বসু

বিগত চার বছর আমাদের কাজকর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা তুলনা মূলক ভাবে বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদাও অধিকতরভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায়, এখনও সর্বতোভাবে চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

ভবিষ্যতের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বর্তমানে ব্যাণ্ডেল ও কোলাঘাটে নির্মীয়মান তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি। বিগত চার বছরের উৎপাদন ক্ষমতা ৩৫০ মেগাওয়াটের মতো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমরা আশাকরি আগামী ১৯৮৩ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ৮৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

সারা পশ্চিমবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। জনসাধারণের সহযোগিতায় আমরা অনেকটা পথ এগিয়েছি। তাঁদের সেবায় আজ নিজেদের আরও সার্থকভাবে নিয়োজিত করার শপথ দৃঢ়তর করলাম।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

সমকালীন

সমকালীন প্রবন্ধের পত্রিকা

২৫ বছর মাসিক পত্রিকারূপে নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছর থেকে সমকালীন ত্রৈমাসিক হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বৈশাখ, শ্রাবণ কার্তিক ও মাঘ প্রতি বছর ৪টি করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট বা রিপ্লাইকার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থে প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না—সমকালীন 'প্রবন্ধের পত্রিকা'। লেখার মধ্যে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করবেন না। ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা-হরফে লিখে দিবেন।

'সমকালীন'-এর গ্রন্থ-পরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা 'শিল্প' 'দর্শন, 'সমাজ-বিজ্ঞান' ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৭০০০৮৭
এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫